মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী [রহ.]

বাতিল যুগে যুগে



বাতিল যুগে যুগে

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী [রহ.]
সম্পাদনা : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২,

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক



https://t.me/islaMic_fdf

তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৯ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭ ঈ.
প্রথম প্রকাশ : ১৫ মার্চ ১৯৯০ ঈ.

বাতিল যুগে যুগে

□ প্রকাশক : হাফেয মাওলানা আহমদ আলী
মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
 □ প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার
□ কম্পোজ : বইঘর অক্ষরায়ণ ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ৮৪ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70136-0002-2

উৎসর্গ

নাসিরা,
দিলরুবা ও
মুবাশ্‌শিরাকে

তোমাদের আব্বু

অবতরণিকা

সত্য আর মিথ্যা, আলো আর আঁধার, হক আর বাতিলের দ্বান্দ্বিক লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবী। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতেই শুরু হয়েছে এদের বিরামহীন দ্বান্দ্বিক অভিসফর। ছায়ার মতই অনুসরণ করে চলছে একটি অন্যটিকে। এ যেন পৃথিবীর অমোঘ বিধান। মূলত হক ও বাতিলের এই উপলব্ধি মানুষের স্বভাবজাত। তা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিকতা এবং হীনস্বার্থ চরিতার্থের অন্ধ উন্মাদনায় মত্ত হয়ে সর্বদাই এক দল লোক বাতিলের অনুসরণ করছে অত্যন্ত জোরে সোরে। এমনকি আল্লাহতে বিশ্বাসী লোকদেরকে টুটি চেপে ধরে এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পাশবিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে তারা। ফলে শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের বিরামহীন সংঘর্ষ। ঘাত ও প্রতিঘাতের এ সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সহ্য করতে হয়েছে আল্লাহতে বিশ্বাসী বিপ্লবী কাফেলার প্রতিটি ব্যক্তিকে কত জুলুম, নিপীড়ন। বরণ করতে হয়েছে তাদেরকে বহু কষ্ট ক্লেশ জ্বালা ও দুঃসহ নির্যাতন। কারাগারের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে বিনিদ্র দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তাদেরকে বহু রাত, অগণন রজনী। হারাতে হয়েছে তাদেরকে বহু আপনজন। তথাপি ইলাহী বলে বলীয়ান, নববী আদর্শে অনুপ্রাণিত, শহীদী মৃত্যুর দৃপ্ত কামনায় সঞ্জীবিত হকের পতাকাবাহী দলটি মুখোমুখি সংগ্রাম চালিয়ে যায় অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে। বাতিলের রক্তচক্ষু, শয়তানিয়াতের প্রলোভন, শাদ্দাদিয়াতের খলচাতুরী, ফিরাউনিয়াতের উদ্ধত অহংকার, জাহিলিয়াতের হঠকারিতা এবং আবাইয়াতের অন্ধ অনুকরণ কিছুই তাদেরকে হক্কানিয়াতের প্রতিষ্ঠা এবং রব্বানিয়াতের অনুসরণ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি ক্ষণিকের

জন্যও। পিছপা হননি তাঁরা কখনো নিজেদের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী থেকে। নিরলস সাধনা, অসাধারণ বিচক্ষণতা ও অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা সামনের দিকে পা পা করে।

তাঁদের এ প্রচেষ্টা, মুজাহাদা, কুরবানী এবং ত্যাগের বিনিময়েই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শান্তির রাজপথ, ফিরে এসেছিল মানবতাবোধ, দূরীভূত হয়েছিল হানাহানি, মারামারি, চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক, লুটতরাজ, যিনা-ব্যভিচার প্রভৃতি ঘৃণ্য কার্যকলাপ। কায়েম হয়েছিল মদীনায় এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। এতদসত্ত্বেও বাতিলের পদচারণা নিঃশেষ হয়ে যায়নি কখনো। বরং কালের বাঁকে বাঁকে নবতর পোশাকে আবৃত হয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে তারা ইসলামের মৌলিক আকীদা ও মুসলমানদের ধর্মাদর্শের উপর। এমনকি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার বীজ বপনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শতধা বিভক্ত করার লক্ষ্যে দাঁড় করায় তারা মুসলিম নামধারী কতিপয় ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে। এদের মাঝে ইহুদী-সন্তান ছদ্মবেশী আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। শিয়া, খারিজী, রাফিযী প্রভৃতি তৎকালীন বাতিল মতাদর্শগুলো সাবাঈ চক্রান্তের অন্যতম ফসল। এমনিভাবে বর্তমানকালের কাদিয়ানী, চকরালুভী, বিদআতী এবং মওদুদী ফিতনাগুলোও এই বাতিল চক্রান্তেরই ফলশ্রুতি। উল্লেখিত বাতিল মতাদর্শগুলোর পাশাপাশি চির অভিশপ্ত, পথভ্রষ্ট খৃষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের তৎপরতা এবং মুসলিমবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রুসেড যুদ্ধের পর গঠিত অরিয়েন্টালিস্টদের জামাতসহ ফ্রয়েডের যৌনবাদ, ডারউইনের শক্তিবাদ এবং কাল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ ইত্যাদি তাদেরই বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক, অবাস্তব এবং

অকল্যাণকর কর্মসূচী। বাতিলের চোখ ঝলসানো মনোরম দৃশ্য, মনমাতানো শ্লোগান, আকর্ষণীয় বক্তৃতা এবং বজ্রধ্বনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাতিলের কাল দরিয়ায় এ দেশের বহু সূর্য সন্তান।

এহেন অবক্ষয়ের করাল গ্রাস থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে ঈমানী দায়িত্ববোধের প্রেক্ষিতে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী তাগুতী শক্তিসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে কি করে আমরা এ নব্য জাহিলিয়াতের মোকাবিলা করতে পারি এবং নিজেকে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাঁটি ও যোগ্য উত্তরসূরীরূপে গড়ে তুলতে পারি এরই জন্য অধীনের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আল্লাহ পাক এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুলিয়াতের শানে ভূষিত করলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। তিনি আমাদের সকলের জন্য খায়রের ফয়সালা করুন এবং সর্বপ্রকার ফিতনা ও গুমরাহী থেকে হেফাযত করুন। আমীন!

— লেখক

সম্পাদকের কথা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লিআলা রাসূলিহিল কারীম

আম্মাবাদ!

হক ও বাতিলের লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবী। শয়তান ও শয়তানিয়াত সব সময়ই চেয়েছে হক ও ন্যায়ের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু পরিণামে সব সময়ই মহান রাব্বুল আলামীন হককেই বিজয়ী করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাস হকের জয়ী হওয়ার ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস বাতিলের খতম হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এ-ই পৃথিবীর আবহমান কালের ধারা। আল কুরআনে ঘোষণা হয়েছে—

হক এসেছে বাতিল অপসৃত হয়ে গেছে। আর বাতিল তো অপসৃত হয়েই থাকে।

বাতিলের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার রূপের যেন শেষ নেই। একেকবারে একেকরূপ ধরে সে মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়েছে; হাজারো আঙ্গিকে সে মানুষকে প্রবঞ্চিত করতে চেয়েছে; অন্ধকারের ধ্বংসকর গহ্বরের দিকে টেনে নিতে চেয়েছে। কখনও তো মনোমুগ্ধকর দর্শনের আকারে মুখব্যাদান করে এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও তাকে হকের পোশাক পরে দীনি সুরতে রূহানিয়াতের পবিত্র সারল্য নিয়ে প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে। আবার কখনও দীনি জেহাদী আন্দোলনের মোহময় উন্মাদনার আড়ালে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে দেখা গিয়েছে। কখনও বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রগতি ও তরক্কীর আকর্ষণীয় দাবী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আবার কখনও সমাজকল্যাণ ও দুর্বল শ্রেণীর অধিকারের দাবী আদায়ের সংগ্রামের আবেগময় বাণী শুনিয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে চেয়েছে। বহু তার রূপ, লাখো তার শ্লোগান।

কিন্তু হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা একান্ত দয়া পরবশ হয়ে মানুষের একান্ত কল্যাণ কামনায় আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস-সালামের মাধ্যমে ওহীর ইলমের সিলসিলা জারী করে প্রত্যেক যুগেই বাতিলের আসল চেহারাকে ফাঁস করে

দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলার রাহ্নুমায়ীতে আম্বিয়া কিরাম ও তাঁদের অনুসারীগণ জীবনব্যাপী সাধনা ও কুরবানীর মাধ্যমে বিদীর্ণ করে দিয়েছেন বাতিলের আপাত মোহময় অবগুণ্ঠনকে। আখিরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এ সিলসিলার শেষ ধারা, আর তাঁর এই উম্মত হল সে প্রয়াসের আখিরী জামাআত। আম্বিয়া কিরামের অনুসরণে সাহাবী, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, মুজাদ্দিদীন, আঈম্মা, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন এবং আলিম-উলামা ও সুলাহায়ে উম্মত স্ব স্ব যুগে সমকালীন মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এ পথে কোন বাধাই তাঁদের বাধা হয়নি, কোন কুরবানীই যেন কুরবানী বলে মনে হয়নি। উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও শাফিঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, শায়খ ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাযালী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, কাসিম ন্যানুতবী ও গাংগুহী, শায়খুল হিন্দ, শায়খুল ইসলাম মাদানী ও হাকীমুল উম্মত থানবী প্রমুখ মুসলিহীনে উম্মত এ ধারারই এক একটি সোনালী কড়ি। শেষ নবী সারওয়ারে কাওনায়ন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিয়ামত পর্যন্তের জন্য জানিয়ে গেছেন উম্মতকে– সব সময়ই এ উম্মতের মাঝে একদল থাকবে যারা হককে নিয়ে বিজয়ী থাকবে, হকের উপর থাকবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা আরোপকারীদের আরোপনা থেকে, মূর্খদের জাহেলী ব্যাখ্যা থেকে এবং অবিমৃশ্যকারীদের বাড়াবাড়ি থেকে এ দীনকে পবিত্র রাখবেন। [বুখারী শরীফ]

আমাদের এ যুগ বাতিলের কঠিনতম আহরের যুগ। এর পূর্বে আর কখনও এত ভীষণতা নিয়ে বাতিল এসে মুখব্যাদান করেছিল কি না আল্লাহ জানেন। অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে যেমন একদিকে প্রকৃতিবাদিতা ও নাস্তিক্যবাদিতা, ডারউইনিজম, কম্যুনিজম, ফ্রয়েডিজম ইত্যাদি রূপ নিয়ে মানব সমাজের লালিত ধারণা ও বিশ্বাসগুলোকে তছনছ করে দেয়ার পাঁয়তারা করে; আরেক দিকে ইসলামের নামে মওদুদীবাদ, কাদিয়ানিজম, শিয়া ও বিদআতী

মতবাদের আড়ালে আবার খারিজী, রাফিজী, নাসেবী ও বাতেনী মতবাদের নব উত্থানের হীন প্রয়াস দেখা যায়।

এ যুগ সন্ধিক্ষণে আকাবির ও আসলাফের আলোকে পূর্বসুরী হকপন্থী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের চিন্তাধারার আঙ্গিকে বর্তমান যুগের নব্য বাতিলদের মুখোশ উন্মোচন করতে এগিয়ে এলেন বিদগ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস, একান্ত স্নেহভাজন অনুজ প্রতিম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী তাঁর ঈমানী তাকিদে 'তায়েফাতুমমিন উম্মাতি'– এর দায়িত্ব পালনে। অতীত বাতিলসমূহের পর্যালোচনা করে নব্য বাতিলের প্রায় সবকটি রূপকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অপারেশন করেছেন তিনি **'বাতিল যুগে যুগে'** নামের ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ এ বইটিতে। আমি তাঁকে জানি, এই লক্ষ্যে উম্মতের এক 'তাইফা' গড়ে তোলার পথেও এক উদ্যমী অভিযাত্রী তিনি। আল্লাহ তাঁকে উভয় জাহানে জাযা দিন।

পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া আমি দেখেছি, পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। এর সব ত্রুটির দায়িত্ব আমার, আর সাফল্য যদি হয় তবে তা আল্লাহর রহমতের জন্যই। সুধী পাঠক! যদি এ সম্পর্কে মন্তব্য রাখেন, ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে দেন তবে আমরা কৃতার্থ হবো এবং যথার্থ পর্যালোচনার পর স্বীকৃতিসহ আগামী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রয়াস পাব।

আল্লাহ আমাদের সব মেহনত কবুল করুন এবং আমৃত্যু হিদায়েতের উপর দৃঢ় রাখুন, অন্যদের জন্য আমাদেরকে হিদায়েতের ওয়াসীলা হিসাবে গ্রহণ করুন আর সকল প্রকার গোমরাহী, ফেতনা ও বাতিল থেকে হিফাযত করুন। আমীন!

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
মুহাদ্দিস. জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা
গুলশান, ঢাকা।

আমাদের কথা

সৃষ্টির শুরু থেকেই হক-বাতিলের সংঘাত চলে আসছে এবং তা চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। হকের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে সময়ের বিবর্তনে বাতিলের ধরন পাল্টেছে। অনেকটা নতুন বোতলে পুরনো মদের মতো। কিন্তু বাতিল বাতিলই। তা যে সাজে যে রূপেই আসুক না কেন। দীন সম্পর্কে অসচেতন মানুষ বাতিলের চোখ ঝলসানো ধাঁধায় পড়ে ধোঁকা খেতে পারেন। কিন্তু হকের আয়নায় বাতিলের কদর্য রূপ স্পষ্ট।

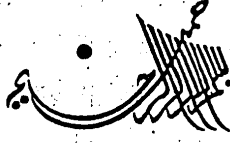
ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তাবিদ, কর্মবীর গবেষক আলেমে মাওলানা ইসহাক ফরিদী (রহ.)-এর দীনের খেদমতে আবির্ভাবটা ছিল ধূমকেতুর মতো। অল্প সময়ের হায়াতেও তিনি যে খেদমত করে গেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনবদ্য কিছু রচনা অত্যন্ত পাঠক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অবহেলিত বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা তা যথাসাধ্য পরিশীলিতরূপে পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি। **বাতিল যুগে যুগে** তাঁর এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

আল্লামা ইসহাক ফরিদী (রহ.) কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুগে যুগে বিভিন্ন রূপে এবং সাজে আপতিত বাতিলকে চিহ্নিত করেছেন অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে। তাঁর শ্রমলব্ধ এই কর্ম প্রয়াস পাঠককে হক ও বাতিল চিনে নিতে যেমন সহায়তা করবে তেমনি বাতিলের থাবা থেকে বেঁচে থাকার উপায়ও বাতলে দিবে। আমাদের শ্রম সফল হবে– যদি একজন পাঠকও বইটি পড়ে হক ও বাতিল চিনে আলোকিত হকের মিছিলে শামিল হন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে হক-এর উপর কায়েম রাখুন। আমীন!

মাকতাবাতুল আখতার — বিনীত

ঢাকা। — আহমদ আলী

সূচিপত্র



বাতিল কত প্রকার ও কি কি

বাতিল কি, বাতিলের পরিচয় কি, বাতিলের রূপরেখা কি, কিভাবে তারা হকের উপর আক্রমণ করছে, কোন্ পথে তাদের আগমন এবং কোন্ পথে তাদের প্রস্থান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ও সার্বিক উপলব্ধি থাকা হকপন্থী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে একান্তভাবে অপরিহার্য। অন্যথায় হকের উপর চলা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবীতে উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই আজ আমাদের অনেকের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে হকের উপর চলা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

অতএব, এ সত্যটির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা আর আমাদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ, অতীত অবহেলার খেসারতও আমাদের উপর কম আসেনি এবং বর্তমানেও এ অভিশাপ থেকে আমরা মুক্ত নই।

এহেন অবক্ষয় ও বাতিলী আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বাতিল কত প্রকার ও কি কি সে সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার।

কুরআন ঘোষিত, নবী নির্দেশিত, সাহাবী বাস্তবায়িত, সলফে সালিহীন তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসৃত আকীদা পথ ও মতের পরিপন্থী প্রতিটি ব্যক্তি ও জামাআতই হল বাতিল। এরাই হল মূলত মুসলমানদের শত্রু।

সাধারণত বাতিল দুই প্রকার

মৌলিকভাবে বর্তমান বিশ্বে দুই ধরনের বাতিল আমাদের সামনে বিদ্যমান। এদের কেউ তো হক ও হক্কানিয়াতের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ করছে, আর কেউ আক্রমণ করছে অত্যন্ত পরোক্ষভাবে। এদের মধ্যে পরস্পরে বাহ্যিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও উভয় দলের লক্ষ্য হল এক ও অভিন্ন। একটি দল বাহ্যত ও প্রকাশ্যেই ইসলামবিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে চিহ্নিত, আর একটি দল হল তারা, যারা ইসলামের মুখোশ এঁটে ইসলামের বিরোধিতা করছে। বর্তমান বিশ্বে স্পষ্টত ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহের মাধ্যমে মৌলিকভাবে তিনটি দর্শনই গোটা পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১. ডারউইনের সার্ভাইবেল অব দি ফিটেস্ট বা শক্তিমানেরই টিকে থাকার মতবাদ।

২. ফ্রয়েডের যৌনবাদ।

৩. কালমার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ।

হকের মুখোশ এঁটে যারা নিজেদেরকে ইসলামপন্থী বলে পরিচয় দিচ্ছে এবং সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে মোটামুটিভাবে তারা পাঁচ দলে বিভক্ত।

১. শরীআ মতাদর্শ।

২. কাদিয়ানী মতবাদ।

৩. ইনকারে হাদীসের ফিতনা।

৪. বিদআতী সয়লাব।

৫. মওদুদী ফিতনা।

ডারউইনের মতবাদ

জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে ডারউইনের বিবর্তনবাদ জ্ঞানীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অত্যন্ত দারুণভাবে। ১৮৫০ সনের দিকে ইংলেন্ডের বীগল জাহাজে চড়ে ডারউইন আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জ এবং উপকূলবর্তী দেশগুলো ভ্রমণ করেন। তার এ ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পশু ও পাখির প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা করা। এ গবেষণার ফল হিসাবেই তার যুগান্তকারী 'প্রজাতির উৎপত্তি' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এর এক যুগ পর 'মানুষের আবির্ভাব' নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থখানি বিজ্ঞান জগতে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করে। ফাটল ধরায় বৈজ্ঞানিকদের বহু চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যায়। অনেকেই স্বীকৃতি দেয় তাকে একজন স্বার্থক যুগ প্রবর্তক হিসাবে।

মূলত ডারউইনের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ নতুন জাতির উদ্ভবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলে।

১. আত্মবিভাজনের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি।

২. আকস্মিক পরিবর্তন।

৩. বংশানুক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ।

৪. জীবন সংগ্রাম।

৫. প্রথমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব, তারপর তাদের ক্রিয়া।

▶ **আত্মবিভাজনের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি :** ডারউইনের মতে পৃথিবীর আদিম এক বা একাধিক কোষ নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। একটি জীবকোষ নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুটি জীবকোষে পরিণত হয়। আবার এ জীবকোষ দুটির প্রত্যেকটি নিজেদেরকে দ্বিধা বিভক্ত করে। এ আত্মবিভাজন ক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। ফলে অসংখ্য জীবকোষের সৃষ্টি হয়। এবার এ জীবকোষগুলো অসংখ্যভাবে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।

▶ **বংশানুক্রমে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ :** এ সম্পর্কে ডারউইন বলেন, জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তন বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়। এ

সংক্রমণের ফলে জীবদেহে সাধিত হয় আমূল পরিবর্তন। ব্যক্তি-দেহের এ পরিবর্তন দেহের অনুকূল হলে সমস্ত জাতিই বেঁচে থাকে। কেননা, জাতি তখন জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারে। আর যদি পরিবর্তন দেহের প্রতিকূল হয় তবে কালক্রমে ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জাতিও বিলুপ্ত হয়ে যায় অতীতের অতল গহ্বরে।

▶ **জীবন সংগ্রাম :** ডারউইন মনে করেন, জগতে জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। কারণ, এ জগতে যত জীব আছে সে অনুপাতে বেঁচে থাকার উপকরণ নেই। যা আছে তা একেবারেই অপ্রতুল অপর্যাপ্ত। ফলে বেঁচে থাকার জন্য আরম্ভ হয় জীবদের ভেতরে বিরামহীন প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা এত তীব্র যে, স্বাভাবিকভাবেই তা দ্বন্দ্বের আকারে প্রকাশ পায়। ডারউইন এ দ্বন্দ্বের নাম দিয়েছেন জীবনযুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যারা জয়ী হয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তারাই বেঁচে থাকে। তারাই হল যোগ্যতম। প্রকৃতি তাদেরকেই উপযুক্ত বলে নির্বাচন করে নেয়। তাদের জীবকোষের পরিবর্তন দেহের অনুকূলে হয়। আর যারা জীবনযুদ্ধে হেরে যায় তাদের কোষের পরিবর্তন দেহের প্রতিকূলে হয়। তারা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না আর তখন। প্রকৃতিও তাদেরকে আর যোগ্যতম বলে মনে করে না। অবশেষে তারা হয়ে যায় ধ্বংস।

▶ **প্রথমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব তারপর তাদের ক্রিয়া :** ডারউইন মনে করেন, জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তন জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায়, আকস্মিকভাবে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়, পরে এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হয়। আকস্মিকভাবেই চোখ, কান, নাক প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। তারপর এগুলো নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত হয়। ডারউইনের মতে, চোখের সৃষ্টির পরই তা দেখার কাজে নিযুক্ত হয়, কানের সৃষ্টির পরই তা শ্রবণ কাজে নিয়োজিত হয়। অনুরূপ অবস্থা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেলায়ও সত্য। তার মতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর উৎপত্তির ব্যাপারে পরিবেশের কোন প্রভাবই কার্যকর হয় না; বরং এগুলোর উৎপত্তি আকস্মিক এবং পরে এগুলোর কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, প্রথমে জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব হয়, তারপর তাদের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

ডারউইনের মতবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য

উপরের আলোচনা থেকে ডারউইনের মতবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য আমরা খোঁজে পাই। প্রথমত জীব জগতের ক্রমবিবর্তন বা অভিব্যক্তির মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই এবং এর পেছনে কোন আধ্যাত্মিক শক্তিরও প্রেরণা নেই। বরং আত্মবিভাজন, জৈবিক ক্রমবিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচননীতি অনুযায়ীই এ পৃথিবীতে নতুন জাতির উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত অভিব্যক্তির ধারা অনুসারে কোন বিশেষ প্রাণীর বংশধরের সাথে তার সাদৃশ্য থাকলেও পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা বৈশিষ্ট্য নয় এবং সম্ভবও নয়। যেমন- মানুষ ও বানরের মাঝে তা সম্ভব হয়নি, অথচ বানর থেকেই মানুষের উৎপত্তি।

পর্যালোচনা

ডারউইন সাহেবের এ বিবর্তনবাদী দর্শন একটি সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের ক্রমবিবর্তিত রূপ মাত্র। ষড়যন্ত্রটি হল, অভিশপ্ত ইহুদী জাতির। বারংবার ধৃষ্টতার অপরাধে লাঞ্ছিত হয়ে দুনিয়ার ডালে ডালে ফিরছিল তারা। ফলে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের প্রতি জন্ম নিয়েছে তাদের মনে চরম আক্রোশ।

তাই গোটা পৃথিবী থেকে আল্লাহর নাম নিশানা মুছে ফেলে তাঁর বান্দাদেরকে জঙ্গলের বানরে পরিণত করার জন্য তারা এ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। কতিপয় মূর্খ, জাহেল ও অপরিণামদর্শী ভক্তের কারণে তার এ ষড়যন্ত্র সাময়িক ও আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান লোকের দরবারে এ কখনো স্থান পায়নি। সমাদৃত হয়নি এ থিউরী তার সহবিজ্ঞানীদের নিকট। কারণ, তার এ মতবাদে অসংখ্য ভ্রান্তি, অত্যধিক দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে ডারউইনের মতবাদের অযৌক্তিক দিকগুলো তুলে ধরছি।

১. ডারউইন বলেছেন, আদিম এক বা একাধিক জীবকোষ থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান জীব জগতের উৎপত্তি হয়েছে এবং জীবকোষগুলো আত্মবিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে চলছে। কিন্তু কোন্ বিশেষ নিয়মে এদের দ্বিধা বিভাজন চলছে ডারউইন তার কোন সঠিক

উত্তর দেননি। তিনি প্রকারান্তরে এখানে আকস্মিকতার কথা ভেবে নিয়মের কথা এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। অধিকন্তু পৃথিবীর আদি জীবকোষটিকে বা জীবকোষগুলোকে কে সৃষ্টি করেছেন, এর উত্তরে ডারউইন বলেন– সম্ভবত ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে প্রথমত আদি জীবকোষগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে তিনি একটু পরোক্ষভাবে এবং হালকাভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। যা তার আকীদা, বিশ্বাস এবং দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

২. জীবকোষের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ডারউইন সাহেব আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার সাথে সাথে নিজের অজ্ঞতারও পরিচয় দিয়েছেন অত্যন্ত হালকাভাবে। কারণ, কোন কিছুকে আকস্মিক বলার উদ্দেশ্য বা অর্থ হল তার বাস্তব ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে যাওয়া। আর বাস্তব ভিত্তিক কোন বস্তুর ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে যাওয়া বা না দিতে পারাই হল মূর্খতা। সুতরাং নতুন জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে ডারউইনের ব্যাখ্যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. 'জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তন বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয়' বলে ডারউইন যে দাবী করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, মাতা-পিতার সকল বৈশিষ্ট্যই আগন্তুক সন্তানের মাঝে সংক্রামিত হতে পারে না। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, ডারউইনের বক্তব্য হল অবাস্তব এবং কল্পনাপ্রসূত।

৪. জীবন সংগ্রামকে ডারউইন সাহেব প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্যতম নিয়ম বলে উল্লেখ করেছেন। এ কথাটিও একেবারে অযৌক্তিক। জায়গা ও খাদ্যের জন্য জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যে কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে প্রাণীর ভেতর যে কেবল হিংসা এবং স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হত্যালীলাই প্রচলিত তা নয়। আত্মত্যাগ এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ ত্যাগ ইত্যাদিও দেখা যায় তাদের মাঝে অত্যন্ত বিপুলভাবে।

৫. প্রাকৃতিক নির্বাচনের নামে ডারউইন যে কথাটি বলেছেন তাও নিছক কল্পনা বিলাস মাত্র। কেননা, তিনি প্রকৃতিতে মানব সত্তা আরোপ করে তার উপর দিয়েছেন নির্বাচনের ভার। তবে এ অচেতন প্রকৃতি কি করে নির্বাচনের কাজ আঞ্জাম দিবে তা কারো বোধগম্য নয়। কেননা, নির্বাচন হল বুদ্ধিনির্ভর প্রক্রিয়া। গ্রহণ ও বর্জনের প্রশ্ন আছে এতে। বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে ভাল মন্দের যাচাই করতে হয় এ নির্বাচনের মধ্যে। কোন আকস্মিক নিয়মে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধিহীন প্রকৃতির

উপর নির্বাচনের দায়িত্ব আরোপ করে পশুবাদের প্রবর্তক জনাব ডারউইন সাহেব কী চরম জড়বোধের পরিচয় দিয়েছেন বিশ্ববাসীর নিকট।

৬. 'জীবন সংগ্রামে জয়ী জীবই এ পৃথিবীতে টিকে থাকে' ডারউইনের এ কথাটির মানে হল– 'জোর যার মুল্লুক তার'। ডারউইনের এ থিউরী জঙ্গলের জীবদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বিবেকসম্পন্ন জীবন মানুষের বেলায় কি তা আদৌ প্রযোজ্য? তাহলে মানুষ এ কথাটিকে জংলী বলে আখ্যা দেয় কেন? এখানেই শেষ নয়, বরং এসব বর্বরতাকে রন্ধ করার জন্য মানুষ আইন-আদালত, পুলিশ, সৈন্য, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সবকিছুরই ব্যবস্থা রেখেছে এ পৃথিবীর বুকে। বিবেক বিরহিত, বিবেচনা বিবর্জিত নিছক জীবেরা এ সবের সন্ধান পাবে কোথায়? মূলত পশুবাদের অবতার জনাব ডারউইন জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জীবোত্তর বৈশিষ্ট্যটি তাহকীক করার বা তলিয়ে দেখার সুযোগ পাননি জীবনে।

তাই তিনি আবহমান কালের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গোটা মানবের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে বসলেন অবলীলায়। বস্তুত এসব নীতিমালা হল মানব সন্তানের জন্য। পশুর জঙ্গলে এ সবের প্রয়োজন কোথায়? তাই তাদের থেকে কোন ভাল কিছুর আশা করা বলদ কিনে দুধ খাওয়ার আশা করার মতই। বলদ থেকে যেমন দুধ খাওয়ার আশা করা যায় না, ডারউইনের থেকেও তেমন ভাল কথার আশা করা যায় না।

বিবর্তনবাদের এসব অসারতা এবং অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও আমাদের যুব মানসিকতা আজ বিভ্রান্ত। তারা আজ গতিহারা, তারা আজ সন্ধিহান। এহেন বিভ্রান্তিকর নাযুক পরিস্থিতিতে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানুষ ও সমাজকে পরিচালনা করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য। আর এ সম্পর্কে সহীহ, সঠিক এবং বিশুদ্ধতম তথ্য পরিবেশন করেছেন যুগে যুগে আগত আল্লাহ প্রেরিত হযরাত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়াস সালাম।

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন ও মনীষীদের বাণী

ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রমাণ করেছে যে, যাবতীয় সৃষ্টি নিতান্ত নীচু স্তর হতে উন্নতি লাভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যে মানব জাতি

সৃষ্টির সেরা তা ছিল নীচ ধরনের প্রাণী বিশেষ। পরে উন্নতি লাভ করে বানরের সীমারেখায় উপনীত হয়। অতঃপর তা তাদের আকার অতিক্রম করে মানুষে পরিণত হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে কোনই উদ্দেশ্য নেই এবং এর পেছনে কোন আধ্যাত্মিক শক্তিরও প্রেরণা নেই।

ডারউইনের এ কথা সম্পূর্ণভাবেই অবাস্তব। কারণ, যে যুগ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে সে যুগ থেকেই মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে আসছে অব্যাহত গতিতে। আসুরী, মিসরী, কালদ্বানী, ইহুদী সবাই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ বিষয়টি বর্ণনা করে কুরআন বলছে- আল্লাহ্ যখন বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশ নির্গত করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী করে বললেন- 'আমি কি তোমাদের আল্লাহ নই? তখন সবাই বলে উঠলো- হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী রইলাম।' [আরাফ : ১৭২ নং আয়াত]

অনেক সময় বাহ্যিক কারণে আল্লাহর অস্তিত্বের এ অনুভূতিটি চাপা পড়ে যায়। তাই আল্লাহ্ বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রাকৃতিক আইন-কানুন ও নিয়ন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন-

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে অবধান কর, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাকা হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য। মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা জানতো সে সম্বন্ধেও তারা আর সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। [সূরা হাজ্জ : ৫ নং আয়াত]

এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, জীব শ্রেষ্ঠ মানুষের উৎপত্তি এবং তাদের বংশবৃদ্ধি আকস্মিক এ্যাক্সিডেন্টের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে বিরাট সৃষ্টি রহস্য ও সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা।

অধিকন্তু এ বিশাল পৃথিবীও আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সামনে। সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এ পৃথিবীর প্রতি গভীরভাবে নজর করলেও ডারউইন এবং তার শিষ্যদের নিকট এ বিষয়টি অস্পষ্ট থাকত না। কারণ, মানুষ যখন কোন বস্তুকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল দেখতে পায় তখন সে এ কথা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয়ই কোন সুদক্ষ শিল্পী বা কোন বুদ্ধিমান সত্তাই এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমনিতেই এটি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়নি। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, যে বিশ্ব এত সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ তাও এমনি করে হয়ে যায়নি। বরং এর পেছনেও রয়েছে এক সুদক্ষ শিল্পীর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। কুরআন মজীদে এ সুনিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করে নিয়ন্ত্রণকারী সত্তার অস্তিত্বের উপর জোরালো ভাষায় প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

'(আল্লাহর কারিগরি দেখ) যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি না? অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে।'

এ আয়াতের দ্বারাও পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ পৃথিবী পূর্ণাঙ্গভাবে চিরনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট নয় বরং কোন শক্তিমান সত্তাই তা সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও গবেষণার যুগ। গবেষণা আজ বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। বিশ্বের শত শত রহস্য উদঘাটিত হয়েছে, অনেক সত্য ঘোমটা ফেলে আত্মপ্রকাশ করেছে। জন্ম দিয়েছে বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তারাও বহু চিন্তা-ভাবনার পর আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের কথা স্বীকার করেছেন, যা দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর পূর্বে কুরআন মজীদ অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষায় পেশ করেছিল।

নিউটন বলেন, বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে স্থান ও কালের হাজার হাজার বিপ্লব অতিক্রম করেছে। তা সত্ত্বেও তাতে যে শৃঙ্খলা ও সুনিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয় তা একজন নিয়ন্ত্রক ছাড়া সম্ভব নয়। এ নিয়ন্ত্রকই হলেন সর্বাদি সত্তা, জ্ঞানবান ও শক্তিমান মহান আল্লাহ।

এ কালের সবচেয়ে বড় দার্শনিক **হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন,** এ রহস্যগুলো নিয়ে যতই চিন্তা-ভাবনা করি ততই তা সূক্ষ্ম বলে মনে হয়। এতে নিশ্চিত বুঝা যায় যে, মানুষের উপর এমন একটি চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে যেখান থেকে হয়েছে সকল বস্তুর উৎপত্তি।

ক্যামিল প্লামারিয়ন বলেন, কোন শিক্ষাগুরুই এটা বুঝতে পারছে না যে, বিশ্বের অস্তিত্ব কি করে হল এবং কিভাবে তা অটুট রয়েছে। বাধ্য হয়ে তারা এমন একজন স্রষ্টা স্বীকার করে নিলেন, যিনি সদা বিরাজমান ও সক্রিয়।

অধ্যাপক লিনি বলেন, শক্তিমান ও বুদ্ধিমান আল্লাহ্ নিজ অদ্ভুত কারিগরির মহিমা নিয়ে আমার সামনে এভাবে উদ্ভাসিত হল যে, আমার চোখ দুটি তাঁর প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং আমি পুরোপুরি তন্ময় হয়ে পড়ি। প্রত্যেকটি বস্তুতেই, তা যতই ছোট হোক না কেন, তাঁর অদ্ভুত শক্তি, আশ্চর্য কৌশল ও বিচিত্র অনবৈদ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

ফুন্টন বিশ্বকোষে বলেন, আমাদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করাই পদার্থবিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এর মহৎ উদ্দেশ্য হল বুদ্ধি সঞ্জাত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ব স্রষ্টার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উদঘাটনে নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

তাই আমাদের আকীদা হল, এ মহাবিশ্বের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি অনাদি, অনন্ত। তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। তাঁর না থাকা অসম্ভব। প্রশংসনীয় সব গুণাবলী দ্বারা তিনি মণ্ডিত ও সব ধরনের দোষ ও ত্রুটি থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাশীল। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি সম্যক দ্রষ্টা, তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই এবং কোন সহযোগীও নেই। তাঁর নযীর নেই কিছুই, তিনিই হলেন বে-মিছাল। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে, ইবাদত ও উপাসনা লাভের অধিকারে, বিশ্বজাহানের শৃঙ্খলা বিধান ও সবকিছুর পোষণে কেউ বা কোন কিছুই তাঁর শরীক নেই, সহকারী নেই। ইবাদত ও চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন এবং পবিত্রতার অধিকারী কেবল তিনিই। তিনি অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল সৃষ্ট বস্তুর রিযিক দান করেন, সবকিছুর অসুবিধা ও কষ্ট দূর করেন। আল্লাহ তাআলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র, তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলী

সবকিছুতেই অনিত্যতা ও আদিত্ব থেকে মুক্ত তিনি জওহার আরয নন। তিনি দেহ বিশিষ্ট নন এবং কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতেও আবদ্ধ নন, তিনি আছেন আরশের উপর। কিয়ামতের পর তাঁর দীদার হবে মুমিনদের। তিনি যা চান তা হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি অনপেক্ষ, কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর উপর কারো আইন, কারো নির্দেশ চলে না। তাঁর নিজ কাজ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হয় না। কিছু করা তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তাঁর প্রতিটি কাজই হিকমতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন, তিনি ব্যতীত যথার্থ কোন নির্দেশদাতা নেই, নেই কোন হাকিম। তকদীর, ভাল মন্দ সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই আসে, তাঁর অন্তহীন ও অসীম নিজস্ব জ্ঞান যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সবকিছুই বেষ্টন করে আছে। সকল বিষয়কেই ঘটবার পূর্বে ঘটবার যোগ্য করেন তিনি।

ফ্রয়েডের কাম সর্বস্ববাদ বা যৌনবাদ

অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের কামসর্বস্ববাদ বা যৌনবাদ সকল জ্ঞানীজনের নিকটই সুপরিচিত। মন কি, মনের প্রকৃত স্বরূপ কি? এ সবের বিশ্লেষণে আধুনিক জগতে যে সব প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে, এ সবের মাঝে ফ্রয়েডের চিন্তাধারা হল অভিনব। মনকে চেতনাশীল মানসিক প্রক্রিয়া বা বিবেকসম্পন্ন বলে এতদিন যে মতবাদগুলো প্রচলিত ছিল ফ্রয়েড সেগুলোর বাইরে মনের আরেকটি নতুন দিকের সন্ধান দিলেন। এ দিকটি হল মনের অচেতন বুদ্ধিহীন দিক। ফ্রয়েড এবং তার অনুসারীদের মতে মন শুধু কতক চেতনা, প্রতীতিবোধ এবং বিবেক ইত্যাদি সম্পন্ন প্রক্রিয়ার সমষ্টি নয়। মন চিন্তাশীল আধ্যাত্মিক দ্রব্যও নয় বরং মন হল রহস্যময় সমুদ্র তলদেশের ন্যায়। ফ্রয়েডের মতে মনের উপরিভাগের প্রতি লক্ষ্য করে মনের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। বরং রহস্য উদঘাটন করতে হলে আমাদেরকে আরো গভীরে যেতে হবে অর্থাৎ মনের অচেতন ও অজ্ঞান ভাগের গভীরে। কারণ, চেতনের চেয়ে অচেতন অনেক গভীর ও সুবিস্তৃত। ফ্রয়েডের মতে বিবেকের চেয়ে আবেগ বেশি অর্থপূর্ণ। তার মতে মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা

ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে শুধুমাত্র কাম। তবে বিবেক যেহেতু সর্বদা পাহারাদারের মত টহল দিচ্ছে তাই আমরা অশোভন কাজ ও অন্যায় আচরণ থেকে অনেকটা বিরত থাকি। ফলে বাইরে বাইরে আমরা যথেষ্ট ভদ্র এবং মার্জিত কিন্তু বিবেকের শাসনে আমরা জোর করে ভদ্র হয়ে উঠি। ফলে আমরা আমাদের অনেক কামনা, বাসনা ও ইচ্ছাকে অবদমন করি এবং ঠেলে দেই এগুলোকে মনের গভীরে। সেখানে এগুলো সৃষ্টি করে নানা অশান্তি। পরিশেষে সাইকসিস, নিউরোসিস, হিসটেরিয়া এবং আরো অনেক অশান্তিকর মানসিক রোগে ভোগতে শুরু করি আমরা অত্যন্ত ভীষণভাবে। ফ্রয়েড এ মানসিক রোগের বর্ণনা ও চিকিৎসার জন্য মনঃসমীক্ষণ নামে এক বিশেষ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন এবং সমীক্ষণে মনের তিনটি স্তরের বর্ণনা করেন। যথা : ১. চেতন (কনসাচ), ২. প্রাকচেতন (প্রি-কনসাচ) ও ৩. অচেতন (আনকনসাচ)। তার মতে অন্য দিক থেকেও মনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ফ্রয়েড বলেন, শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরোধী সচেতন ইচ্ছাগুলো অবদমনের ফলে অচেতন মনে নির্বাসিত হয়ে অজ্ঞাতভাবে বাস করতে থাকে যার সম্পর্কে আমরা অবগত নই। মূলত এসব ইচ্ছা ও প্রয়াসগুলো হল কামজ বা যৌন। এদের সমষ্টিকে ফ্রয়েড বলেন 'ঈদ'। ঈদ অন্ধভাবে কামজ ইচ্ছাগুলোকে সচেতন মনে প্রকাশ করতে সর্বদা সচেষ্ট। তার মানে ছোট ছোট শিশুরাও আত্মকামী। কারণ, তাদের শরীরে কামকেন্দ্র বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই আদর, সোহাগ করাতে তারা আংশিকভাবে কামতৃপ্তি লাভ করে এবং আনন্দ উপভোগ করে। এমনকি দুধের শিশুরাও কামভাবের তাগিদেই দুগ্ধপান করার সময় মাতৃস্তন্য স্পর্শ করে থাকে। এ জন্যই আমরা ছেলেদেরকে পিতৃবিদ্বেষী এবং মেয়েদেরকে পিতৃসঙ্গ কামনা করতে দেখতে পাই।

ফ্রয়েডের মতে, মনের আরেকটি অংশের প্রধান প্রচেষ্টা হল আত্মরক্ষা করা। এর নাম হল 'ইগো'। 'ঈদ' এবং 'ইগো'র অতিরিক্ত মনের তৃতীয় স্তরটির নাম হল বিবেক বা সুপার ইগো। এ বিবেককে আবার কনসায়েন্স, ইগো-আইডিয়্যাল বা সেন্সর নামে অভিহিত করা হয়। এর কাজ ঈদের অন্ধ ইচ্ছাগুলোকে দমন করা। বস্তুত ইগোর অবস্থাটি সঙ্গীন। একে ঈদের প্রবল চাপ এবং বিবেকের শাসন সহ্য করতে হয়। ফ্রয়েড বলেন, আত্মরক্ষার জন্য ইগোর উপরোক্ত দুটি মনিবকেই সন্তুষ্ট রাখতে হয়।

এসব অযৌক্তিক বৈজ্ঞানিক থিউরী অবতারণা করে ফ্রয়েড এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মানুষ তার আদি কাম দ্বারা পরিচালিত। তাই জীবন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে মানুষের জন্য কামজ ও যৌন স্বাধীনতা একান্ত ভাবে অপরিহার্য। এর জন্যই ছিল তার সংগ্রাম ও সাধনা।

পর্যালোচনা

ফ্রয়েডের এ কথাগুলো তার শিষ্যদের নিকট স্বর্গীয় বাণী হিসাবে সমাদৃত হলেও পরবর্তী বিজ্ঞানীদের মনে তেমন কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং কার্লযুং এবং এ্যাডলরের বিশ্লেষণে এতে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা গেল।

১. ঈদ, ইগো ও সুপার ইগো এ তিনভাগে মনকে বিভক্ত করে ফ্রয়েড মনের যে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন এগুলো শুধু কেবল তার কল্পনা এবং অনুমান মাত্র। এ অনুমানের ভিত্তিতে তিনি চেয়েছিলেন কতগুলো বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, তিনি তা পারেননি। মূলত ফ্রয়েড কোন মনোদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেননি। তিনি কেবল মনের বিষয়গুলো দিয়ে মনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন, এই যা। তিনি মনের আলোচনায় যৌন কামনাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। কাজেই অভিনব হলেও মনের স্বরূপ সম্পর্কে তার আলোচনাকে আমরা মেনে নিতে পারি না।

২. অন্তর্হিত বাসনা মাত্রই যে কামজ বা যৌন, এ কথাও ঠিক নয়। কেননা, এগুলো কামজ না হয়ে নানাবিধ বাসনাও হতে পারে যার সম্পর্কে আমরা সকলেই জ্ঞাত। এ সত্যটি অস্বীকার করে ফ্রয়েড শুধু কেবল সত্যের অবমাননাই করেননি বরং চরম ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করেছেন।

৩. 'মানুষ আদি কাম দ্বারা পরিচালিত' ফ্রয়েডের এ কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, অবদমন শক্তিগুলোর উৎপত্তিও আদি কাম থেকেই। কিন্তু এ তো কখনো হতে পারে না। কারণ, পাপ থেকে জন্ম নিয়ে পাপ বাসনাগুলোকে অবদমন করা চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী বলার মতই আজগুবি ব্যাপার। আর যদি বলা হয় যে, পাপ বাসনা থেকে এগুলোর উৎপত্তি নয় বরং অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক বা জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনে এগুলোর উৎপত্তি, তাহলে মানব জীবনে কাম ব্যতীত আরো নানাবিধ ফ্যাক্টর কার্যকরী বলে

স্বীকার করে নিতে হয় অকপটে। এতে স্ব-বিরোধিতাই করতে হচ্ছে। অবশেষে ফ্রয়েডের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. পশুবাদ ও বানরবাদের প্রবর্তক ডারউইন যেন পরোক্ষভাবে এ কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন যে, মানবেতর জীব বানরের মাঝে যেমন মা, বোন, খালা, ফুফু, নানী, দাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই অনুরূপভাবে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মাঝেও এ পার্থক্য জিইয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। তবে সময়ের অভাবে তিনি এ কথাটি বলে যেতে পারেননি। পরে তারই আশীর্বাদে যৌনবাদের অবতার হিসাবে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন জনাব ফ্রয়েড সাহেব। আবহমান কাল থেকে মানুষ যা ভেবেছে মাথা দিয়ে, কালমার্কস তা ভেবেছিলেন পেট দিয়ে, আর ফ্রয়েড ভাবলেন আরো এক ধাপ নিচে এসে। সন্দেহ নেই মানুষ মাথা দিয়ে ভাবে, জীবেরা পেটের তাগাদায় চলে, আর তারও নীচের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে ছুটে ষাঁড়ের পালেরা। ফ্রয়েডের এ থিউরী জংলী জানোয়ারদের জন্য তো প্রযোজ্য। আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের জন্যও কি প্রযোজ্য? ফ্রয়েডিয়ানদের এহেন ধর্মহীন মতাদর্শ এবং যৌনবাদের অভিশাপে আজ সারা পৃথিবী অভিশপ্ত। কলুষিত আজ বিশ্বমানবতা, ধর্ষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে দেশে দেশে মহিলারা মিছিল নিয়ে ঘুরছে। কেউ তাদের ইজ্জতের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না, আর পারবেও না।

তাই মনোবিজ্ঞানের অন্তরালে যৌন স্বাধীনতাকামী লোকদের কথায় কান দেয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। আর মন কি ও মনের হাকীকত কি? এ পর্যায়ে সঠিক ব্যাখ্যা লাভ করতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে মনের খালেক আল্লাহ পাক এবং ইলমে ওহীর অন্যতম বাহক হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও তাঁদের যোগ্য উত্তরসুরীদের নিকট, তাঁরাই দিতে পারেন এ সম্পর্কে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য।

মনের হাকীকত এবং যৌন সংযমশীলতা

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, কুরআন ও হাদীসে সাধারণত মন বলে দুটি বস্তুকেই বুঝান হয়েছে। প্রথমত বুকের বাম দিকে রক্ষিত গাঁজর সদৃশ গোশতের টুকরাটিকেও মন বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত

রব্বানী বা রূহানী লতীফাকে মন বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে এ দুয়ের মাঝে রূহানী লতীফাটিই হল আসল। এটিই হল উপলব্ধি, অনুভূতি এবং জ্ঞান লাভের মাধ্যম বা যরীয়া এবং এই হল উপহাস, পরিহাস ও সম্বোধনের একমাত্র উপযোগী সত্তা। তবে এ রূহানী লতীফার সাথে ঐ গোশতের টুকরাটির রয়েছে বিরাট যোগসূত্র। ফলে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না কখনো।

ইমাম গাযালীর মতে মনের অবস্থা খুব সঙ্গীন। কারণ, বিবেক ও কামনা এতদুভয়ই এতে বিদ্যমান। প্রত্যেকেরই রয়েছে সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী। সর্বদাই এ দুই-এর মাঝে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এ সংঘর্ষে বিবেক যদি জয়ী হয় তাহলে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে এর আছর বা ক্রিয়া পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। পরিচালিত হয় তখন সবকিছুই সঠিক পথে। অন্যথায় সব কিছুই হয়ে যায় বিপথগামী। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি উত্তমভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের শরীরে গোশতের একটি টুকরা রয়েছে। যখন সে টুকরাটি ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীরই ঠিক থাকে, আর যখন ওটি খারাপ হয়ে যায় তখন সারা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। মনে রেখো, সে গোশতের টুকরাটি আর কিছু নয়, ওটির নামই হল অন্তর বা মন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমস্ত শরীরের সংশোধন মনের সংশোধনের উপর নির্ভরশীল। তাই ভাল মানুষ হতে হলে ভাল সমাজ গড়তে হলে আমাদের প্রত্যেককে নিজের মনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এ রত্নে সামান্যতম ময়লা, পংকিলতা ও দূষণীয় কোন কিছু স্পর্শ করতে না পারে।

মানুষ আদি কাম দ্বারা পরিচালিত এবং তার ইচ্ছা ও প্রয়াসগুলো হল মূলত কামজ বা যৌন– এ কথা বলে ফ্রয়েড যৌন স্বাধীনতার যে শ্লোগান দিয়েছেন এ পথে মূলত কোন দেশ বা জাতির শান্তি আসতে পারে না এবং হবে না এর দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান। বরং এতে সমস্যাই বাড়তে থাকবে অত্যন্ত প্রবলভাবে। পচন ধরবে সমাজ, দেশ, জাতি সব কিছুতেই। কারণ, আবহমান কাল থেকেই এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যদি কোন সমাজে যৌন অভিশাপ নেমে আসে তাহলে সে সমাজের ধ্বংস নিশ্চিত। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যৌন অভিশাপ থেকে বেঁচে থেকে সত্যিকার কল্যাণের পথে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন– উভয় পা'র মাঝে যা আছে (লজ্জাস্থান) এবং

উভয় পাটির মাঝে যা আছে (জিহ্বা)-এর জামানত যে দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের জামানত দেব। [বুখারী, তিরমিযী শরীফ]

দৃষ্টির কারণেই মানুষ সাধারণত যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, আটকে পড়ে অশোভনীয় কার্যকলাপে, ডেকে আনে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ভয়াবহ পরিণাম। ইসলাম তাই এ যৌনবন্যার ভয়াবহ সয়লাব থেকে এ পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের দৃষ্টিকে সংযত রাখার জন্য দ্ব্যর্থহীন আহ্বান জানিয়েছে। কুরআন বলছে– মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। এরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। [সূরা নূর : ৩০-৩১ আয়াত]

মূলত একজন মানুষের কামিয়াবী ও সফলতা এ সংযমের উপরই নির্ভরশীল, যৌনস্বার্থ চরিতার্থের উপর নয়।

আল্লাহ বলেছেন– অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনয়ী নম্র নিজেদের সালাতে, যারা বিরত থাকে অসার ক্রিয়াকলাপ হতে, যারা সক্রিয় যাকাত প্রদানে এবং যারা সংযত রাখে নিজেদের যৌন অঙ্গকে। [সূরা মুমিন : ১-৫]

যৌন জীবনের আবেগে পুরুষ যেভাবে অস্থির হয় সাধারণত নারীরা সেভাবে অস্থির হয় না। কারণ, তাদের মাঝে সংযম, ধৈর্য এবং সহ্যক্ষমতা অনেক বেশি। তাই নারী সমাজে যখন যৌনকাতরতা দেখা দেয় এবং যখন তারা সামনে অগ্রসর হয়ে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, দুর্বলচিত্ত পুরুষ তাতে অতি সহজেই নিজের গা এলিয়ে দেয়, বইতে থাকে তখন সমাজ জীবনে ব্যভিচারের বন্যাস্রোত। এ দূষিত আবর্জনাযুক্ত পানির স্রোত থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা কল্পে নারীদেরকে সতর্ক করে কুরআন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বলছে– তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগত থাকবে। [সূরা আহযাব : ৩৩ আয়াত]

যৌনস্বাধীনতা এবং যৌনক্ষুধা নিবারণের ব্যাপক ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জন্য এক চরম লজ্জাষ্কর কাজ এবং অত্যন্ত হীনতম কথা। কারণ, এতে বিবেকসম্পন্ন মানুষ এবং পশুদের মাঝে কোন

তারতম্য আর বাকী থাকে না। তাই ইসলাম প্রথম থেকেই এ সবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার। পক্ষান্তরে ইসলামী তামাদ্দুনের গোটা ইবাদত ব্যবস্থাই তাহারাত বা পবিত্রতার সাথে বিজড়িত। উদাহরণস্বরূপ সাওমের কথাটিই ধরে নেয়া যাক। আমরা সকলেই জানি যে, শুধু উপবাস থাকার নামই সাওম নয়, অভিধানগত অর্থও এ কথার দিকে ইংগিত করে। কারণ, সাওমের আভিধানিক অর্থ হল নিবৃত্তি। কিসের নিবৃত্তি? এ সম্বন্ধে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) বলেছেন, যেহেতু পাশবিক কামনার প্রাবল্য ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অর্জনের পক্ষে অন্তরায় সুতরাং এসব উপকরণকে পরাভূত করত পাশবিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করাই হচ্ছে সাওমের সূক্ষ্মতম তাৎপর্য। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সাওমের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন ও উন্নত প্রকৃতির বিকাশ। এজন্য দেখা যায়, এ দুনিয়ায় যারা সত্যিকার মনুষ্যত্ব লাভ করেছেন তারা সকলেই আল্লাহর প্রত্যাদেশ পাওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল সিয়াম সাধনা করেছেন। মরহুম মাওলানা সুলায়মান নদভীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তুর পাহাড়ে আল্লাহর প্রত্যাদেশ হিসাবে তাওরাত গ্রহণ করার সময় দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আহার-পানীয় ত্যাগ করে মানবিক জীবনের বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জিল প্রাপ্ত হওয়ার লগ্নে অনুরূপ সাধনায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত করেছিলেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কুরআনুল কারীম নাযিলের পূর্বে দীর্ঘ ছয় মাস কাল পর্যন্ত হেরার গুহায় সাধনায় জীবনযাপন করেছিলেন। সৈয়দ সুলায়মান নদভী বলেন, পাশবিক শক্তিকে আয়ত্তাধীন করার ব্যাপারে সিয়ামের প্রধানতম শিক্ষা হল মানব জীবন ভোগের জন্য নয়, মানব জীবন হল ত্যাগের জন্য। এ শিক্ষা লাভ করে যাতে গোটা বিশ্ববাসী দৃষ্টি, হৃদয় এমনকি কল্পনার নির্মলতা অর্জনের সাথে সাথে জীবনের সর্বস্তরে কলুষহীনতা ও ইফ্ফাতের অধিকারী হতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা একটি নির্দিষ্ট চাঁদে তাঁর কালামে প্রত্যয়শীল সকল মানুষের জন্য সিয়াম সাধনাকে বাধ্য করে দেন। তাই প্রকৃত মানবিক চরিত্রের বিকাশ এবং এ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাতলানো তরীকা মতে পাশবিক প্রবৃত্তিকে পূর্ণাঙ্গ দমন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দিন।

কালমার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ

কালমার্কস হলেন বর্তমানকালের এক অমর নাম। তিনি হলেন আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ব্যক্তি। তিনিই সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করে চিন্তার সীমা-রেখাকে বিস্তৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই কালমার্কসই হলেন এ মতবাদের প্রধান প্রবর্তক।

১৮৬৭ সালে কালমার্কস তার ডাসক্যাপিটাল নামক যুগান্তকারী গ্রন্থে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রবাদের এক অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করেন। এতে চিন্তা ও কর্মজগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শোষিত জনগণের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়। তাই পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে এটাকে গ্রহণ করে মার্কসের মন্ত্রশিষ্য কমিউনিস্ট জগতের লোকেরা। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রধানত তিনটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা।

২. উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

৩. শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদ।

১. ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা : শিক্ষাগুরু দার্শনিক হেগেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কালমার্কস ইতিহাসকে দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের মূলে ছিল ভাবের ক্রিয়া, আর মার্কসের মতে এর মূলে রয়েছে বস্তু ও আর্থিক পরিবেশ। তার ধারণা মতে, প্রত্যেক সমাজের আইন-কানুন, রাজনৈতিক অবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, জীবনের মান প্রভৃতি নির্ণীত হয় তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। মার্কস বলেন, ধনোৎপাদন রীতিই সমাজ ব্যবস্থার মূল নিয়ামক এবং আর্থিক পরিবেশই মানুষের চিন্তাধারা ও আদর্শকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ধনোৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে গড়ে উঠে বহু রাজনৈতিক সংগঠন। ফলে

শ্রেণী বিভাগ সংগঠিত হয় সমাজ জীবনে। তখন সমাজ নতুন হতে নতুনতর পথে প্রবাহিত হয় এবং প্রতীক্ষায় থাকে এক অনাগত সমাজ জীবনের।

২. উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব : মার্কস বলেন, উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়, এর ফলেই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে রূপান্তর ঘটে। কারণ, যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ কারণে যান্ত্রিক যুগের মূলধনে মালিক কৃষি যুগের জমিদার শ্রেণীর স্থান দখল করে নেয় এককভাবে। অর্থবলে মূলধনের মালিকগণ উৎপাদন ব্যবস্থায় একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ফলে বিত্তহীন শ্রেণী অনন্যোপায় হয়ে সংস্থানের উদ্দেশ্যে মালিক শ্রেণীর নিকট নিজেদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মালিক শ্রেণী এ বিত্তহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রমজীবীগণকে তাদের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারমূল্য অপেক্ষা কম মূল্য পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে আরম্ভ করে, অথচ শ্রমই হল একমাত্র উৎপাদনের উপাদান।

শ্রম দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারমূল্য ও শ্রমিকদেরকে দেয়া মজুরীর মাঝে বিরাজমান এ পার্থক্যকেই মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। মার্কসের মতে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্য নিজেরাই ভোগ করে বলে বর্তমানে শ্রেণী সংগ্রাম উগ্রতার রূপ ধারণ করেছে। তাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে একদিন তারা কেড়ে নিয়ে আসবে ধনীদের হাত থেকে ক্ষমতার মসনদ। ফলে ধনতন্ত্রের কবরে রচিত হবে এক শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা।

৩. শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদ : কালমার্কস বলেন, সামাজিক ইতিহাস নিছক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ধনী, গরীব, বিত্তশালী ও বিত্তহীনের মাঝে বিরাজমান এ সংগ্রাম আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে অব্যাহত গতিতে।

অর্থনৈতিক পরিবেশই হল এ দ্বন্দ্বের মূল কারণ। কেননা, ধনোৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের মাঝে নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। এ পৃথিবীতে যাদের হাতে ধনোৎপাদন উপাদান আছে তারা অন্য শ্রেণীকে পদানত করছে ক্রমান্বয়ে। ফলে ইতিহাসের নাট্যমঞ্চে সর্বদা

শ্রেণী সংগ্রামের অভিব্যক্তিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যটিই আমাদের চোখে পড়ে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে। যেমন- গ্রীসের নাগরিকগণ দাসগণকে পদানত রেখে নিজেরা সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে প্রাথমিক যুগে। রোমের পেট্রিসিয়ানগণ প্লেবিয়নদেরকে, মধ্যযুগে সামন্তবর্গ ভূমিদাসদেরকে এবং শিল্প বিপ্লবের যুগে কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকদেরকে খাটিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। এ যেন পৃথিবীর অমোঘবিধান।

মার্কসের মতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে এবং এর ধ্বংসের বীজ এতেই লুকায়িত আছে। কারণ, বিত্তশালী লোকদের হাতে সম্পদ যখন বিপুল পরিমাণে কুক্ষিগত হবে তখন এক শ্রেণীর লোক হুড়হুড় করে রাতারাতি বিত্তহীন হয়ে যাবে। ফলে শুরু হবে বিত্তশালী ও বিত্তহীন সম্প্রদায়ের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অবিরাম সংগ্রাম। সাধারণত এ সংগ্রামে বিত্তহীন সম্প্রদায় ক্ষমতা দখল করে নেয়। মার্কস এ ঐতিহাসিক সূত্রটি ধরে বলেন, শ্রমিক ও পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের মাঝে বিরাজমান এ সংগ্রাম একদিন তীব্ররূপ ধারণ করবে। তখন শ্রমিকগণ পুঁজিপতিদেরকে আঘাত করে নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং কায়েম করবে তারা তথায় শ্রমিক রাজ, অবসান ঘটবে তখন শ্রেণী সংগ্রামের। মার্কসের মতে সংগ্রামরত যুগটিকে বলা হবে বিপ্লব যুগ। আর ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যখন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তখন এ শ্রেণীহীন অবস্থাকে বলা হবে বিপ্লবোত্তর যুগ। এ অবস্থায় আর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। আস্তে আস্তে রাষ্ট্রব্যবস্থা অন্তর্হিত হয়ে যাবে। একে মার্কসের ভাষায় সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের পাখায় ভর করে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে দাঁড় করাতে গিয়ে কালমার্কস সত্যকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত নগ্নভাবে। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি যে পৃথিবীকে স্বর্গীয় রাজ্যে পরিণত করার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তবের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। অধিকন্তু নৈতিকতার দিক থেকে

এ থিউরী হল একেবারে অন্তসার শূন্য। তাই বিদগ্ধজনেরা মার্কস সাহেবের এ ভ্রান্তনীতির সমালোচনা করেছেন অত্যন্ত তীব্রভাবে। তার কতিপয় ভ্রান্তি নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. মার্কসের বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধনতন্ত্র তার অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার এ ভবিষ্যত বাণী সফল হয়নি। বরং বর্তমানে বহু পুঁজিবাদী দেশ নিজেকে সংশোধন করে পূর্বের তুলনায় আরো দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে, অগ্রসর হচ্ছে ক্রমশ তথাকার শ্রমিকদের অবস্থা এবং তাদের জীবনের মান। ফলে সমাজতন্ত্রের পুরোহিত মার্কসের কথাগুলো দিন দিন অবাস্তব এবং অন্ত সারশূন্য বলে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে আজকের জনমনে।

২. অর্থনৈতিক উন্নতি ও অবনতিই হল সামাজিক উন্নতি ও অবনতির মূল প্রতিবিম্ব। কাল মার্কসের এ কথাটিও ঠিক নয়। কেননা সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে মৌলিক এবং সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে ধর্মনীতির। যা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আবহমানকাল থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট স্বীকৃত এ চির সত্যটিকে অস্বীকার করে মার্কস নিজের অর্বাচীনতারই পরিচয় দিয়েছেন বৈ আর কি।

৩. মার্কসের ভবিষ্যতবাণী হিসাবে সমাজবাদ সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড বা জার্মানীর মত শিল্পায়িত দেশসমূহেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে রাশিয়া ও চীনের মত কৃষিপ্রধান বা শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। এতে মার্কসের দর্শন বাস্তবের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

৪. 'মানুষের ইতিহাস নিছক একটি শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।' মার্কসের এ কথাটিও একটু নাটকীয় বলে মনে হচ্ছে। কারণ, মানুষের ইতিহাসে শ্রেণীগত সংঘর্ষ যেমন সত্য পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের কথাটিও এর চেয়ে অধিক সত্য। এ সমস্ত গুণাবলীই করেছে মানুষকে আদর্শস্থানীয়। আবু বকর (রা.)-এর টাকায় কত কৃতদাস মুক্তি পেয়েছে, উসমান (রা.)-এর টাকায় কত সর্বহারা স্বচ্ছল হয়ে যাকাত নিতে অস্বীকার করেছে, মানুষের খলীফা খাদ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে কিভাবে খাবার দুর্বলের বাড়ি পৌছিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে সুলতান স্বয়ং আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কাজীর

কঠোর হুকুম পেয়ে কাজীকে পুরস্কৃত করেছেন, কি করে চিরশত্রুর বিরাট বাহিনীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে মুহূর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন, মানব প্রেমের জয়গান গাওয়ার শিক্ষা দিতে গিয়ে মানুষ কিভাবে সানন্দে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন। এরা কি এসব ইতিহাস পড়েননি? পড়বেনই বা কি করে? এসব কথা জানবার জন্য তো তাদের কোন বিধান নেই। যদি থাকত তাহলে তারা শ্রেণী সংগ্রামের উন্মাদনা জাগিয়ে দু'মুঠো ভাতের ভাওতা দিয়ে জীবশ্রেষ্ঠ মানব জাতিকে গরু-ছাগলের মত নিকৃষ্টতম পোষা জীবে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত হতো না।

মার্কসবাদীরা মূলত মানুষের মহত্ত্ব ভুলিয়ে দিয়ে হিংস্র পাশবিকতা জাগিয়ে তুলে মানবীয় সমস্যার সমাধান কামনা করেছে। অতএব, এরা হল মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু। তাদের পথে কোন কামিয়াবী নেই এবং নেই কোন কল্যাণ। সুতরাং এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অশান্ত পৃথিবীতে আমরা যদি কামিয়াবী চাই তাহলে আমাদেরকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে 'সুন্নাতে উলার' দিকে, ফিরে যেতে হবে মহান স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর দিকে।

অর্থনীতি ও ইসলাম

বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি ও পরিবেশের যে সব সমস্যা ও সংঘাত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, তার সমাধানের দাবি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠে। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি সব মতবাদই কোন না কোন সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেই উদ্ভাবিত হয়। তবে এতে কোন শান্তি আসেনি। বরং সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে আরো বহু নতুন সমস্যা, ডেকে এনেছে আরো বহু অকল্যাণ ও অশান্তি। পুঁজিবাদী ও কমিউনিজম ব্যবস্থাতেও এ নীতির বিন্দুমাত্র বরখেলাফ হয়নি।

বস্তুত পুঁজিবাদ ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা পরস্পর বিপরীত দুই সীমান্তবর্তী আদর্শ বিশেষ। কারণ, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিই হল নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক, এতে অন্য কারো কোন হক বা অধিকার নেই। নিজের উপার্জিত সম্পদ যে যেভাবেই ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে, জমা করতে পারবে, পাররে কুক্ষিগত করতে। এতে কারো প্রতিবাদ করার কোন অধিকার নেই এবং করলেও তা গৃহীত হবে না। এ অকল্যাণকর অভিশপ্ত মতাদর্শের ফলে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দল লোক গোটা সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান গ্রাস করে নিয়ে টাকার কুমীর সাজতে আরম্ভ করে রাতারাতি। অপর দিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে আরম্ভ করে। এরূপ অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত সমাজে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, হৃদ্যতা, প্রেম, ভালবাসা, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সাহায্য প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী একবিন্দুও আর বাকী থাকে না। তখন গরীব অসহায় লোকদের সামনে দুটি পথই খোলা থাকে। হয়তো তারা আত্মহত্যা করে এ জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে, না হয় নানাবিধ অপরাধ ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের পংকিল আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করবে।

এ মানবতাবিরোধী মতাদর্শের সংশোধনের লক্ষ্যে কমিউনিজমের আবির্ভাব হয়। তবে এর জন্য তারা যে কর্মনীতি অবলম্বন করে তা অত্যন্ত ভ্রান্ত।

তাদের কথা হচ্ছে, ধন-সম্পদের সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতভাবে তা দখল করে নিজের ইচ্ছামত এতে হস্তক্ষেপ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে এর মুনাফা গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই। এ কথাগুলো মূলত মানব প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর।

পক্ষান্তরে ইসলাম উল্লেখিত এ দুটি বিপরীতমুখী পরস্পর বিরোধী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করে। এর মূলনীতি হল– প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরিই দিতে হবে। সাথে সাথে ধন বণ্টনের ভারসাম্যকেও যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ বলেন–

'এবং ধন-সম্পদ প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সে তার আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, মুসাফির, ভিখারী এবং ঘাড়মুক্ত করার জন্য দান করেছে।' [সূরা বাকারা : ১৭৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে–

'তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে ভিক্ষুক এবং গরীবদের অধিকার রয়েছে।' [সূরা আয-যারিয়াত : ১৯]

সূরা নূরে ইরশাদ করা হয়েছে–

'আল্লাহর ঐ সম্পদ হতে তোমরা দাও যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন।' [সূরা নূর : ৩৩]

কুরআন আরো বলেছে–

'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ প্রদান করেছি তা থেকে খরচ করো।' [সূরা বাকারা : ২৪৪]

পবিত্র কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করার ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সম্পদ কিংবা উৎপাদন মাধ্যমগুলো থেকে কোনটা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ সবের মালিকানায় কোন পার্থক্যও নির্ণয় করা হয়নি।

ব্যক্তি মালিকানার মূলনীতি স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলাম অবশ্যই তার সীমা নির্ধারণ করে দিতে চায়। তাই ইসলামী অর্থ বণ্টন ব্যবস্থায় কোন এক

স্থানে ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদান জমাট বাধতে এবং স্থবির হয়ে থাকতে পারে না; বরং এটা সর্বদাই আবর্তিত হতে থাকে। এতে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য রয়েছে সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ লাভ করার বিরাট সুযোগ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা। সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ফলে সমাজের কোটি কোটি ব্যক্তিকে যাতে অভুক্ত না থাকতে হয় তাই কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে–

'যারা সোনা-রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে, কিন্তু তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না। আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে সেসব গরম করে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু জমা করে রেখেছিলে এখন তার স্বাদ গ্রহণ করো।' [সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫]

কারূনী পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

'(হে নবী!) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, (অন্যদের প্রয়োজনে) তারা কি পরিমাণ ব্যয় করবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমাদের নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সবই অন্যদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করো।' [সূরা বাকারা : ২১৯]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ কুক্ষিগত করে বাড়তি মূল্য লাভ করার হীন চক্রান্তের ভয়াবহ পরিণামের প্রতি ইংগিত করে বলেন–

'যদি কেউ চল্লিশ দিন পর্যন্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে তাহলে সে আল্লাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহও তার সর্বপ্রকার দেখাশুনা ও দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান।' [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

'কোন বস্তি বা জনপদে যদি কেউ অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায় তাহলে উক্ত বস্তির উপর আল্লাহ তাআলার দেখাশুনা এবং নিরাপত্তা বিধানের সকল দায়-দায়িত্বের অবসান হয়ে যায়।' [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

শ্রমিক ও মজুরদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার জোর দাবী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক ও শিল্পপতিদেরকে লক্ষ্য করে বলেন–

'মজুরদের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিক আদায় করে দাও।' [ইবনে মাজাহ ও তাবরানী]

সুষম বণ্টনের প্রতি জোর দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'তিন ধরনের ব্যক্তি এমন, কিয়ামতের দিন যাদের দুশমন আমি হবো। এদের মধ্যে একজন সেও যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিয়ে যাবে পরে তার মজুরী আদায় করে না।' [বুখারী শরীফ]

এমনি করে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ধন-সম্পদের ব্যবহার, মানুষের অধিকার তথা সুষম বণ্টন সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে পথ নির্দেশ করা হয়েছে। যা পুঁজিবাদী এবং কমিউনিজমের অর্থ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে ইসলামই হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং মুকাম্মাল জীবন ব্যবস্থা। সত্যিকারের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের অর্থ হল ইহকাল ও পরকাল এবং বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়। ইসলাম এর কোনটাই অস্বীকার করেনি; বরং একের সাথে অন্যের সমন্বয় সাধন করেছে। আধ্যাত্মবাদ এবং বস্তুবাদের উগ্রতা এবং চরম মাদকতাকে অস্বীকার করে ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘাতের এমন এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে যা অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে নেই। তাই শান্তির অন্বেষায় এদিক ওদিক ছুটাছুটি না করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলেই আমাদের আশ্রয় নেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

শিয়া মতাদর্শ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইসলামী আকীদা ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তেমন জটিল কোন মতপার্থক্য ছিল না– এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। তবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনি (রা.)-এর খেলাফতকালের শেষ যুগে আকীদার ক্ষেত্রে এক নতুন মতাদর্শের উদ্ভব হয়। এখান থেকেই শুরু হয় শীয়া মাযহাবের নবযাত্রা। প্রথম পর্যায়ের বুনিয়াদ ছিল খুবই সাদাসিধে এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। তাদের বুনিয়াদী কথাটি ছিল এই যে, হযরত আলী হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই। বাল্যকাল হতেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিবি খাদিজা (রা.)-এর বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। হিজরতের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আমানত হকদারদের পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আলী (রা.)-এর হাতেই অর্পণ করেন। মদীনাতেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁর সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর শাদী হয়। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, বীরত্ব, বিশ্বস্ততা এবং ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর খেদমতের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁকে মুসলিম ফৌজের নিশান বরদার নিযুক্ত করেন। এমনকি তিনি আলী (রা.)কে 'আমার জন্য মুসার ভাই-এর মত' আখ্যায় ভূষিত করেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তিনিই তাঁর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত হওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। এরা নিজেদেরকে শীয়ানে আলী বা আলীর সমর্থক বলে পরিচয় দিত। কথাগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় হলেও মূলত এ ছিল ইসলামী হিদায়াত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, ইসলাম গোত্রীয় পার্থক্য ও বংশীয় গর্বের সকল সৌধমালাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করত ইজ্জত সম্মান ও নেতৃত্বের মানদণ্ড তাকওয়ার উপর অর্পণ করেছে। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী।' [সূরা হুজুরাত]

এ তাকওয়া ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকরই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। হযরত আলীসহ সকল সাহাবীই এই বিষয়ে একমত ছিলেন। তাই তিনিই ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। এতদসত্ত্বেও হীনস্বার্থ চরিতার্থের চরম উন্মাদনায় মাতাল হয়ে শীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের ভ্রান্ত কথাগুলো লোক সমাজে ছড়াতে থাকে অত্যন্ত তড়িৎগতিতে। মূলত এ ভ্রান্ত আকীদার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছিল ইহুদী সন্তান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা। বস্তুত ইহুদী জাতি পূর্ব থেকেই ছিল ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী। ইসলামের জয়যাত্রা দেখে তাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে; খাক হয়ে যায় তাদের মন। ইসলামের অগ্রযাত্রা যে করেই হোক রহিত করতে হবে, এই ছিল তাদের একমাত্র ধ্যান।

তারা মুসলিম সমাজে অনৈক্যের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে আলী প্রেমের আবরণে অবিরাম গতিতে নিজেদের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। তাদের এ ষড়যন্ত্র ও কারসাজির কারণেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে শাহাদাতবরণ করেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনি (রা.) এবং পরবর্তীকালে সংঘটিত হয় জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন-এর মত আত্মঘাতী দুই দুইটি লড়াই। অবশ্য হযরত আলী (রা.) তাদের এ কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে কুফা থেকে মদীনায় নির্বাসিত করেন। ফলে শীয়া মতবাদ তাকিয়্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীকালে তারা বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) গুনিয়্যাতুত্তালিবীন এবং শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তুহফায়ে ইছনা আশারিয়্যায় এদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এদের প্রধান দলটিকে শীয়া ইমামিয়্যাহ বা শীয়া ইছনা আশারিয়্যাহ্ বলা হয়। সাধারণত এ ফেরকাই বর্তমানে শীয়া নামে আখ্যায়িত এবং এরাই ইরানের বর্তমান বিপ্লবের নায়ক ও বাহক। নিম্নে তাদের কয়েকটি মূলনীতি তুলে ধরা হল :

১. আকীদায়ে ইমামত : শীয়া মাযহাবের মূল ভিত্তি আকীদায়ে ইমামতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের ধারণা, যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত, তেমনিভাবে ইমামগণও আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত। নবীগণের মত তারাও সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র এবং মাসুম। এ সকল ইমামদের প্রতি ওহী আসে আল্লাহর পক্ষ হতে নবীগণের মতই। জীবনের সর্বস্তরে তাদের আনুগত্য ফরয। শারঈ বিধানকে তারাই কার্যকরী করেন। এমনকি তারা কুরআনে হাকীমের যে কোন বিধানকে প্রয়োজনে রহিত এবং মওকুফ করারও অধিকার রাখেন। আল হুকুমাতুল ইসলামিয়্যাহ গ্রন্থে খোমেনী বলেন– আমাদের ইমামদের জন্য এমন বৈশিষ্ট্যময় স্থান রয়েছে যে স্থানে কোন নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতা এবং প্রেরিত কোন নবী পর্যন্ত পৌছতে পারে না।

২. সাহাবা বিদ্বেষ : শীয়াদের দ্বিতীয় মূলনীতি হল, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা। তাদের ধারণা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর আবু যর, মিকদাদ এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.) ব্যতীত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারী সকল সাহাবীই ইসলাম ত্যাগ করে কাফির বা মুরতাদ হয়ে যান। অধিকন্তু হযরত আলী (রা.)ও যেহেতু প্রথম খলীফার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনিও অনেক শীয়াদের এহেন অসন্তোষ থেকে রেহাই পাননি।

৩. তাহ্রীফে কুরআন : শীয়াদের তৃতীয় আকীদাটি উপরোল্লিখিত আকীদা থেকে অধিক জঘন্য ও অত্যন্ত মারাত্মক। এ হল তাহ্রীফে কুরআন বা কুরআন বিকৃতির আকীদা। শীয়াদের ধারণা, বর্তমান কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নয়। এ তো হল হযরত উসমানের সাজানো কুরআন। এতে বহু যোগ-বিয়োগ হয়েছে। বাদ দেয়া হয়েছে মূল কুরআন থেকে 'সূরাতুল বেলায়েত' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। তাই বর্তমান কুরআন অবিকৃত নয়। এ কথাটিকে প্রমাণ করে ১২৯২ হিজরীতে মির্জা হুসাইন বিন মুহাম্মদ তাকী নূরী তাবরাসী নামক এক শীয়া আলিম 'ফাসলুল খিতাব ফী ইছবাতে তাহ্রীফে কিতাবে রাব্বিল আবরার' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন শীয়া আলিম গবেষকদের শত শত উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন শরীফে বহু রদবদল এবং অসংখ্য

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এ কুরআন আসল কুরআন নয়। আসল কুরআন তো দ্বাদশ ইমামের সাথে কোন এক অজানা গুহায় প্রোথিত আছে।

৪. শীয়াদের কালেমা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আদর্শ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে শীয়াগণ তাদের জন্মলগ্ন থেকেই অত্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। দাঁড় করায় তারা ইসলামের মোকাবিলায় এক নতুন ধর্ম। প্রচার করতে থাকে তারা নতুন ধর্মের নতুন কালেমা; নতুন উদ্যমে এক অভিনব কৌশলে। জুড়ে দেয় তারা সর্বজন স্বীকৃত কালেমার সঙ্গে আলী ওয়ালীউল্লাহ ওয়াছিয়্যু রাসূলিল্লাহ এবং খলীফাতুহু বেলা ফাসলিন– আলী আল্লাহর বন্ধু রাসূলের অসী ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী খলীফা শব্দগুলোকে।

এ ছাড়াও শীয়াদের আরো বহু ভ্রান্ত আকীদা এবং স্বতন্ত্র মতামত রয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এসবের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে উপরোল্লিখিত চারটি আকীদার উপর চিন্তা করলেই আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, ইসলামের সাথে শীয়া মাযহাবের কত পার্থক্য বিদ্যমান।

পর্যালোচনা

শীয়াদের কথাগুলো ইহুদীদের অনুপ্রাণিত লোকদের নিকট সমাদৃত হলেও ইলমে ওহীতে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হযরত সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নিকট তা কখনো সমাদৃত হয়নি। বরং তাঁরা সব সময়ই এ ফিতনাকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন এবং তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। শীয়াদের গোমরাহী এবং ভ্রান্তির কতগুলো কারণ নিম্নে দেয়া হল।

১. শীয়া সম্প্রদায়ের ইমামত সম্পর্কিত মতবাদটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ এবং ইসলামের চিরস্থায়ী ধর্ম হওয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কারণেই প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে মির্জা গোলাম

আহমদ কাদিয়ানী পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তিই নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার হয়েছে তারা সকলেই নিজ দাবীর সপক্ষে শীয়াদের ইমামত মতবাদ হতে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। মূলত ইসলামের চির দুশমন ইহুদী সম্প্রদায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খতমে নবুওয়তের উপর কুঠারাঘাত করার জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের জন্য চোরাগলি আবিষ্কার করার লক্ষ্যেই এ ভ্রান্ত আকীদার উদ্ভব ঘটিয়েছে- যা কোন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২. শীয়াদের 'সাহাবা বিদ্বেষ' মূলনীতি একেবারেই ভ্রান্ত, যা কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এ আকীদার অন্তরালে তারা ইসলামের চিরন্তনতা ও বিশ্বজনীনতাকেই অস্বীকার করতে চাচ্ছেন অত্যন্ত কৌশলের সাথে। কেননা, তাদের ধারণা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর ইসলাম যেহেতু একদিনের জন্যও টিকে থাকতে পারেনি তাই এ ইসলাম কখনো বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন ধর্মাদর্শ হতে পারে না। অধিকন্তু শীয়াদের এ ভ্রান্ত আকীদার প্রেক্ষিতে এ কথাও প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন অসফল এবং ব্যর্থ মুআল্লিম (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, তিনি যদি সফল এবং সার্থক মুআল্লিম হতেন তাহলে তাঁর সঙ্গপ্রাপ্ত এ সমস্ত লোকেরা কখনো নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ইরতিদাদের আশ্রয় গ্রহণ করতো না।

৩. শীয়াদের তাহ্রীফে কুরআন আকীদাটিও অত্যন্ত ঈমান বিধ্বংসী আকীদা। কারণ, আজ পর্যন্ত কোন কট্টর কাফিরও কথাটি বলতে সাহস পায়নি। শীয়াগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট সে কথাটি প্রচার করে নিজেদের বাচালতা এবং মূর্খতারই পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি এ আকীদা কুরআন হিফাযতের ব্যাপারে ইলাহী প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এক চ্যালেঞ্জও বটে। এ ধৃষ্ঠতার অভিশাপে আজ পর্যন্ত শীয়া সম্প্রদায়ের কেউ সম্পূর্ণ কুরআনের হাফেয হতে পারছে না। অথচ সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে শত সহস্র নয় বরং লক্ষ লক্ষ হাফেযে কুরআন এ পৃথিবীতে বেঁচে আছেন।

৪. শীয়াদের প্রবর্তিত কালেমা অভিশপ্ত ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য। তবে সুন্নী মুসলমানদের জন্য এ কালেমা কোনক্রমেই প্রযোজ্য

নয়। কারণ, এ কালেমা ঈমান বিধ্বংসী কালেমা। এ কালেমার পাঠক, অনুসারীও হলো মুশরিক ফির রিসালাত, এরা মুসলমান নয়। সুতরাং ইহুদীবাদে অনুপ্রাণিত শীয়া সম্প্রদায়ের এ পাঁয়তারা এবং হীন চক্রান্ত থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকা এবং কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করা আমাদের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

শীয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে মনীষীদের মতামত

গুনিয়্যাতুত্তালিবীন নামক গ্রন্থে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন– শীয়া সম্প্রদায়ের কয়েকটি নাম রয়েছে।

১. শীয়া : এ সমস্ত লোকেরা যেহেতু হযরত আলী (রা.)-এর অনুসরণ করে এবং তাঁকে অন্যান্য খলীফাদের উপর প্রাধান্য দেয় তাই তাদেরকে শীয়া বলা হয়।

২. রাফিযী : যে সমস্ত লোক হযরত আবু বকর, হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকে স্বীকার করে না এবং অধিকাংশ সাহাবীদেরকে মান্য করে না তাদেরকে রাফিযী বলা হয়। মূলত শীয়াদের ধর্ম ইহুদী ধর্মের সাথে বিশেষ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইমাম শাবী বলেন, নবী বংশের সাথে শীয়াদের মহব্বত ইহুদীদের মহব্বতের মতই। ইহুদীরা দাবী করে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কেউ ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। ইহুদীরা যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে তেমনিভাবে শীয়াগণও অন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করা হালাল মনে করে। ইহুদীরা যেমন তাওরাতের ভেতর পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে, শীয়ারাও কুরআন শরীফের সাথে অনুরূপ আচরণের প্রয়াস পেয়েছে। তাদের বিশ্বাস বর্তমান কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নয়। ইহুদীরা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে বৈরীভাব পোষণ করে, শীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন কোন দল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে অনুরূপ বৈরীভাব পোষণ করে। কারণ, তাদের ধারণা, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর ওহী যথাস্থানে পৌছাতে ভুল করেছেন, নাউযুবিল্লাহ। তিনি ভুলবশত হযরত আলী (রা.)-এর নিকট ওহী না পৌছিয়ে ওহী

পৌঁছিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট। মোট কথা, তারা হল মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বলাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। [গুনিয়্যাতুত্তালিবীন]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবন তায়মিয়ার বক্তব্য

শীয়া মতবাদের প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক হলো একজন ইহুদী মুনাফিক ব্যক্তি। শীয়াদের মৌলিক বিশ্বাস হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। এতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হযরত আলী (রা.)ই হলেন ইমামে মাসুম। যে ব্যক্তি তার সঙ্গে বিরোধিতা করে সে হল কাফির। তাদের ধারণা মতে, মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্তকে গোপন রেখে ইমামে মাসুম হযরত আলীর সাথে কুফরী করেছিল এবং তারা স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য ধর্ম ও শরীয়তকে পরিবর্তন করেছেন। এমন কি অবশেষে চরম বাড়াবাড়ি এবং জুলুমের আশ্রয়ও গ্রহণ করেছেন। পাঁচ দশজন ব্যতীত সকলেই তারা কাফির। শীয়াগণ নিজেদের দল ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধাচারী সকল ব্যক্তিকেই কাফির বলে মনে করে। যে সমস্ত ইসলামী দেশে তাদের আকীদার প্রাধান্য নেই সে সমস্ত দেশকে তারা কাফির রাষ্ট্র বা দারুল কুফর বলে মনে করে, যা মুশরিক এবং খৃষ্টান রাষ্ট্র থেকেও অধিক নিকৃষ্ট। এ কারণেই তারা মুসলমানদের পরিবর্তে ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে যে সব দল বিদআতের রাস্তা অবলম্বন করেছে নিঃসন্দেহে শীয়া সম্প্রদায় তাদের মাঝে সর্বাধিক গোমরাহ এবং পথভ্রষ্ট। এ জন্য সর্বসাধারণের নিকট এ জামাতই সুন্নাহ বিরোধী জামাত হিসাবে পরিচিত। তাই সাধারণ লোক সুন্নীদের বিপরীতে শীয়া ছাড়া অন্য কিছুই বুঝে না। যখন কেউ বলে যে, আমি একজন সুন্নী তখন তার উদ্দেশ্য এই থাকে যে, আমি শীয়া নই। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, শীয়া সম্প্রদায় খাওয়ারেজ সম্প্রদায় হতেও নিকৃষ্টতর। খারিজীরা আর কিছু না হোক সত্যবাদী, কিন্তু শীয়ারা মিথ্যা বলার ব্যাপারে

সুপ্রসিদ্ধ। খারিজীরা ইসলামে প্রবেশ করে পরে বের হয়ে গিয়েছে, আর শীয়ারা দূর থেকেই ইসলামকে ছুঁড়ে মেরেছে। [ফতুয়ায়ে ইবনে তায়মিয়া]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর বক্তব্য

শীয়ারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে গালি-গালাজ এবং অভিসম্পাত করাকে নিজেদের ধর্ম এবং ঈমানের অঙ্গ বলে সাব্যস্ত করেছে, যা আমানত ও দিয়ানতদারীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে সমস্ত বিদআতী দল নিজেদের বিদআতের কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তন্মধ্যে খারিজী ও শীয়া সম্প্রদায়ই সর্বাধিক দূরে ছিটকে পড়েছে।

শীয়া বা রাফিযীদের বিরাট দল রয়েছে। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণকে কাফির এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের প্রতি অভিসম্পাত করাকে ইবাদত বলে মনে করে। অবশ্য শীয়াদের এসব দল নিজেদের জন্য রাফিযী শব্দটি ব্যবহার করে না। কারণ, হাদীস শরীফে রাফিযীদের প্রতি তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রকার কুফরী কার্যকলাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি কাফির শব্দ ব্যবহার করলে যেমন তারা ক্ষেপে যায় শীয়া রাফিযীদের অবস্থাও তাই। এ দিক থেকে রাফিযীদেরকে হিন্দুদের সাথেও তুলনা করা যায়।

শীয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরকেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবেই বিবেচনা করে। তারা নবী বশংকে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের শত্রু বলে মনে করে। তাদের বক্তব্য, হযরত আলী ত্রিশ বছর পর্যন্ত তাকিয়্যা করত হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সাথে মুনাফিকী সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং তাদের প্রতি অবৈধ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। শীয়াদের এ বক্তব্য একেবারে অমূলক এবং অবাস্ত ব। এ যেন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ। আল্লাহ পাক তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন। [মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী]

শাহ আবদুল আযীয (রহ.)-এর বক্তব্য

শীয়াদের ধোকা এবং প্রতারণার মধ্যে এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তারা বলে– আহলে সুন্নাতের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের ইমাম পবিত্র কুরআন শরীফের মাঝে বহু রদবদল করেছে, বাদ দিয়েছে তারা এমন অনেক সূরা এবং অনেক আয়াত, যার মাঝে নবী বংশের ফাযায়েল, শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের ভালোবাসা, তাদের অনুসরণ এবং বিরোধিতার প্রতি চরম নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। এমনকি এ আয়াত ও সূরাগুলোতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের নাম তাদের প্রতি অভিসম্পাতের কথাও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত ছিল। এ কারণেই এ সমস্ত কথাগুলো তাদের কাছে খুব অপছন্দ লাগে। মূলত নবী বংশের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষই তাদেরকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। সূরা 'আলাম নাশরাহ' থেকে বিলুপ্ত আয়াত এবং কুরআন শরীফ থেকে বিলুপ্ত সূরায়ে বিলায়েতই আমাদের সামনে এ বিদ্বেষের চির সাক্ষর হয়ে আছে। [তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ও বিশ্বাস

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাসূল, তাঁর পর আর কোন নবী নেই। সমস্ত জিন ও মানুষ এবং সারা বিশ্ব জাহানের জন্য হল তাঁর নবুওয়াত। তাই এ উম্মাতের জন্য নয়া কোন নবী প্রেরণেরও প্রয়োজন নেই, ঠিক এমনিভাবে এখন কোন নিষ্পাপ ইমামের অভ্যুদয়েরও কোন দরকার নেই। যিনি নবীদের সে কাজ আঞ্জাম দিবেন যা তাদের পক্ষে পূর্ণতায় পৌছিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সাহাবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণে ও তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঐক্যবদ্ধ। আমাদের আকীদা, আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সাহাবীগণই হচ্ছেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম। আশারা মুবাশ্‌শারা বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী সম্পর্কে বেহেশতি হওয়ার এবং কল্যাণের সাক্ষ্য দেই।

নবী পরিবার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের মর্যাদা এবং সম্মানের আমরা স্বীকৃতি দান করি। তাদের প্রতি আমরা ভালবাসা পোষণ করি। ইসলামে তাঁদের মর্যাদা বহু ঊর্ধ্বে।

সাহাবীগণ মাসুম নন, কিন্তু আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাঁদের সকলের আদালত ও গুনাহে কবীরা থেকে মুক্ত থাকার এবং তাঁদের ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। তাঁদের পরস্পরের ভেতর যে সমস্ত বিবাদ সংঘটিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা মন্তব্য করা থেকে বিরত এবং সতর্ক থাকার আকীদা পোষণ করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর হচ্ছেন যোগ্য খলীফা। এরপর হচ্ছেন যথাক্রমে হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা.)। খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত বা নববী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত এখানেই শেষ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর যথাক্রমে এ উম্মতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা সাহাবীগণের কেবল সদালোচনা করতে পারি। তাঁরা আমাদের ধর্মীয় নেতা এবং পথপ্রদর্শক। তাঁদের সমালোচনা করা, তাঁদের দোষ বর্ণনা করা হারাম, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের জন্য ওয়াজিব। সহীহ হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমার সাহাবীদেরকে তোমরা মন্দ বলো না, তাঁদের সমালোচনা করো না, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তথাপিও সে সাহাবীদের মধ্যে কারো এক মুদ্দ (প্রায় এক কিলো) বা অর্ধ মুদ্দের পরিমাণ দানের সমান হতে পারবে না।

আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। এর মর্ম ও শব্দ সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ পরিপূর্ণ একটি কিতাব। আমাদের আকীদা– কুরআন শাশ্বত, চিরন্তন এবং অভিনব কুরআন মাখলুক নয় এবং একে অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক থেকেই বাতিল স্পর্শ করতে পারে না। এ কিতাব সকল প্রকার তাহরীফ, মানুষের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন থেকে মুক্ত এবং সংরক্ষিত। এতে তাহরীফ হয়েছে বলে যদি কেউ বলে তবে সে ঈমানের গণ্ডিভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন– নিশ্চয়ই আমি নাযিল করেছি এ যিকর (আল কুরআন) আর আমিই এর সংরক্ষক। [সূরা হিজর : আয়াত ৯]

তিনি আরো বলেছেন– একে একত্রিত করা এবং তা পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আমি যখন তা পড়ব (তুমি তখন শুনবে) পরে সেভাবেই তুমি পড়ো। অতঃপর এর ভাষ্যও আমার দায়িত্বে। [সূরা কিয়ামা : ১৭-১৯]

মনের বিশ্বাস এবং ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধতার উপরই আল্লাহর উবুদিয়্যাত এবং দাসত্ব নির্ভরশীল। যদি কারো আকীদা ত্রুটি এবং ঈমানের মধ্যেই যদি বিচ্যুতি থাকে তাহলে তার কোন ইবাদতই কবুল হবে না। ঈমানের বিশুদ্ধতা ছাড়া আল্লাহর কাছে কোন আমলই শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। মূলত ঈমানের বিশুদ্ধতা তাওহিদ, রিসালাত ঈমান বিল গায়ব ওয়াবা'ছ বাদাল মাওত এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার উপরই নির্ভরশীল। এ বিশ্বাস হতে হবে অত্যন্ত নিরঙ্কুশ এবং একেবারে নির্ভেজাল। আমাদের আকীদা, যেমনিভাবে আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাতের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত ও নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকেও কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এর স্থলে ইত্যাদি বলা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই।

কাদিয়ানী মতবাদ

কাদিয়ানী মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনাটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। এতে আমরা কাদিয়ানী মতবাদের সূচনা, তাদের অবস্থান এবং তাদের ভাবমূর্তি সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ উপলব্ধি করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

যুগ যুগ ধরে খৃষ্টান জগত মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করে আসছে, এ আমরা সকলেই জানি। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেড যুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দীন আয়্যুবীর হাতে পরাজিত হওয়ার ফলে খৃষ্টান জগতের ভ্রান্ত অহমিকার পরিসমাপ্তি ঘটে। ভুলে যায় তারা সকল শৌর্যবীর্য, আত্মগরিমার কথা। হারিয়ে ফেলে পুনরায় মুসলমানদের মোকাবিলায় রুখে দাঁড়াবার সেই কঠিন মানসিকতা। মোকাবিলার শক্তি নেই, সাহস নেই, নেই কোন হিম্মত। তথাপিও পরাজয়ের গ্লানি এবং প্রতিহিংসার দাবানলে খাক হয়ে যাচ্ছে তাদের মন। তাই প্রতিশোধ নেয়ার তীব্র প্রয়াসে আবিষ্কার করে

তারা বহু চোরাগলি এবং দাঁড় করায় এ গলিতে বহু গুপ্তচর বা অরিয়েন্টালিস্টদের এক এক বিরাট জামাত। ইসলাহে মাযহাব, ইসলামে নতুন সংস্কার, ইসলাহে দীনে ইসলাম ইত্যাদি আকর্ষণীয় শ্লোগান দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে তারা বহু সংস্থা ও সংগঠন। উদ্দেশ্য হল, অতি সন্তর্পণে ইসলামের মৌলিক আকীদায় কুঠারাঘাত করে মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত করত তাদের নিজেদের মত এক অভিশপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা নিম্নে বর্ণিত কতিপয় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় :

১. তাদের ধারণা, মুসলমানদের ঈমানী দৃঢ়তার প্রধান কারণ হল তারা উলামামুখী। ছোট বড়, সাধারণ অসাধারণ সব ব্যাপারেই তারা আলিমদের শরণাপন্ন হয়। তাই তাদেরকে প্রথমে আলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এ জন্য তারা কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করে।

ক. অরিয়েন্টালিস্টগণ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেছেন : আমি কুরআনকে অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় নাযিল করেছি। সুতরাং কুরআন বুঝার জন্য আলিমদের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। যে কেউ কুরআনের ব্যাখ্যা ও গবেষণা করতে পারে। পবিত্র কুরআনকে বিকৃত বা মুহাররাফ করাই হল তাদের এ বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। এ হীন স্বার্থ চরিতার্থের পথে উলামায়ে কেরামই হলেন একমাত্র বাধা। তাই উল্লেখিত কৌশলের মাধ্যমে যদি এ পথ থেকে আলিমদেরকে হটিয়ে দেয়া যায় তাহলে কুরআনের তাহরীফ এবং কালামে ইলাহীকে বিকৃত করার পথ অত্যন্ত সুগম হয়ে যাবে তাদের জন্য, কথাটি নিশ্চিতভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিল তারা। আলিমদের থেকে মুসলিম জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে অভিশপ্ত গুপ্তচরের দলেরা আলিমদের সম্পর্কে জনমনে ঘৃণা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। তারা বলতে থাকে, এরা মোল্লা, এরা কিছু জানে না, এরা হল সমাজের জন্য বোঝা এবং এরাই হল প্রগতির পথে একমাত্র বাধা। তাই প্রগতিশীল প্রতিটি মানুষের জন্য এদের অনুকরণ এবং সঙ্গ ত্যাগ করা একান্তভাবে অপরিহার্য।

খ. অরিয়েন্টালিস্টদের বক্তব্য হল, ইসলামে ব্যক্তিপূজা নেই। আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কেউ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তাদের এ কথার মূল উদ্দেশ্য হল কুরআন ও হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করা। কারণ,

সাহাবীদেরকে যদি কোন মতে অনির্ভরযোগ্য বা গায়রে ছিকাহ প্রমাণ করা যায় তাহলে তাদের সংকলিত কুরআন এবং হাদীস ভাণ্ডারও হয়ে যাবে অনির্ভরযোগ্য।

গ. অরিয়েন্টালিস্টদের তৃতীয় দাবীটি হল, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাহেঁচড়া করা চরম অভদ্রতা। এ মনোরম শ্লোগানের অন্তরালে তারা যেন এ কথাই বলতে চান যে, সনদের প্রয়োজনীয়তা বলতে কোন জিনিস নেই। বরং রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত অবস্থা নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা নিতান্তই অভদ্রতা। তাই ভাল কথা যে কেউ বলুক না কেন তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এ যেন ভাল কথার ফাঁকে ফাঁকে অরিয়েন্টালিস্টদের বিষ মিশ্রিত ঈমান বিধ্বংসী কথাসমূহ ঢুকিয়ে দেয়ার এক দারুণ প্রবণতা। অথচ ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, দীন সম্পর্কিত যে কোন কথা ব্যক্তি যাচাই করেই গ্রহণ করবে।

ঘ. মুসলমানদেরকে ঈমানহারা করার জন্য আরেকটি বিষাক্ত কৌশল হল, কতিপয় দালাল তৈরি করা। যারা ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য উলামায়ে হক্কানীর বিপক্ষে দিবে নানা বিভ্রান্তিকর ফতোয়া এবং সৃষ্টি করবে ইসলামের মাঝে নতুন পথ ও নতুন মত। এ কাজের জন্য তৈরি করে তারা দুটি দল।

এক. এ দলটি অরিয়েন্টালিস্টদের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য আযাদীপ্রিয় আলিমদের বিরুদ্ধে হামেশা নতুন নতুন ফতোয়া প্রচার করতে আরম্ভ করে। তারা বলতে থাকে, ওরা ওয়াহাবী, ওরা নজদী, ওরা বেয়াদব, ওরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাযীম করে না, ওরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের বড় ভাই বলে মনে করে, ওরা কাফির। এ ধরনের আরো বহু ফতোয়া, আরো বহু কথা। বর্তমানে আমাদের দেশেও এ ধরনের লোকদের পদচারণা দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে।

দুই. আযাদীপ্রিয় মুসলমানদের মন থেকে জিহাদের স্পৃহা চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার লক্ষ্যে অরিয়েন্টালিস্টগণ যে দলটি দাঁড় করায় এদের কর্ণধারই হলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। জনাব মির্জা সাহেব ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাই গোলামীতে পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে ইংরেজ

কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে প্রথম তিনি নিজেকে মুবাল্লিগ বা ধর্মপ্রচারক বলে ঘোষণা করেন। এরপর ১৮৮৮ সনে মুবাল্লিগ পদ ত্যাগ করে তিনি নিজেকে মুজাদ্দিদ এবং মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ বলে দাবী করেন। অবশেষে ১৯০১ সনে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে তিনি নিজেকে নবী বলে ঘোষণা দেন। তৎকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে হক্কানী তার এ মিথ্যা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে দল মত নির্বিশেষে সকলেই তাকে কাফির বলে ফতোয়া দেন। এতে মির্জা সাহেব ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তার এ ভ্রান্ত দাবীকে আরো মজবুত করার জন্য কুরআন ও হাদীসের ভুল এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আমিই হলাম কুরআনে বর্ণিত আহমদ নামের নবী। আমার উপর বিশ পারার মত কুরআন নাযিল হয়েছে। যে আমাকে মানবে না সে হারামজাদা বা জারজ সন্তান। ইসলামের অন্যতম মৌলিক আকীদা হল খতমে নবুওয়াতের আকীদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন আখেরী নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না, এ বিশ্বাস হল ঈমানেরই অঙ্গ। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস মোট কথা শরীয়তের সকল দলীলের দ্বারাই এ আকীদা প্রমাণিত। তাই মির্জা সাহেবের ইসলামবিরোধী এ মতবাদ কারো নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

কাদিয়ানীদের ইসলামবিরোধী আকীদাসমূহ

১. কাদিয়ানীরা বলেন, নবুওয়াতের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শেষ নয় এবং তিনি শেষ নবী নন। বরং তাঁর পরও নবুওয়াতি মিশনের কাজ চলতে থাকবে এবং চলতে থাকবে নবুওয়াতের সিলসিলা। এ দাবীর প্রেক্ষিতে মির্জা সাহেবের বক্তব্য হল, আমিও পূর্ববর্তী নবীগণের মত একজন নবী। যে ব্যক্তি আমার নবুওয়াতকে অস্বীকার করবে সে মুসলমান নয়, সে হল কাফির।

২. মির্জা গোলাম আহমদ এবং তার অনুসারীদের আকীদা হল মিথ্যা। নবুওয়াতের দাবীদার জনাব মির্জা সাহেবের উপর বারিধারার মত সর্বদাই আল্লাহর তরফ থেকে ওহী আসছে, তা কখনো আরবী ভাষায়, আবার কখনো উর্দু ভাষায়, আবার কখনো হিন্দী ভাষায়, আবার কখনো ইবরানী ভাষায়, আবার কখনো এমন ভাষায় যা বুঝে আসে না।

৩. মির্জা সাহেব এবং তার ভক্তদের ধারণা– পরকালের সফলতা এবং মুক্তি মির্জা সাহেবের তালীম ও তার উপর অবতীর্ণ শয়তানী ওহীর প্রতি ঈমান রাখার উপরই নির্ভরশীল। এ আকীদা ও বিশ্বাস ব্যতীত কোন মানুষ নাজাত লাভ করতে পারবে না। এ যেন প্লাবনকালে হযরত নূহ (আ.)-এর তরণীর মত।

৪. কাদিয়ানীদের বিশ্বাস, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হল আল্লাহর পক্ষ হতে মনোনীত পয়গাম্বর। যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করবে না সে জাহান্নামী, কাফির। খতমে নবুওয়াতের আকীদা অভিশপ্ত এবং মারদুদ আকীদা।

৫. মির্জা সাহেবের দাবী– তার মুজিযার সংখ্যা দশ লাখ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযার সংখ্যা তিন হাজার।

৬. কাদিয়ানীদের আকীদা– মির্জা গোলাম আহমদ হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমতুল্য। বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও আরো অধিক সম্মানিত এবং আরো অধিক মর্যাদার অধিকারী।

৭. মির্জা গোলাম আহমদ নিজেকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, হুসাইন (রা.) এবং বনী ইসরাঈলের সকল নবীদের থেকে আফযল বা শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে এবং বলে, মারয়াম তনয় ঈসা মসীহের কথা বাদ দাও, মির্জা গোলাম আহমদই এর থেকে শ্রেষ্ঠ।

৮. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করেছে এবং স্বীয় পুস্তক ও পুস্তিকাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুবাক্য ব্যবহার করেছে।

৯. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার অন্ধ ভক্তদের বিশ্বাস হল– মির্জা সাহেবই নিম্ন বর্ণিত আয়াতের মিসদাক এবং উক্ত আয়াতে আহমদ বলে তাকেই বুঝানো হয়েছে।

'এবং (স্মরণ করুন সেই ঘটনা) যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল– হে বনী ইসরাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল, তোমাদের নিকট পূর্ব হতে যে তাওরাত রয়েছে তার সমর্থক এবং আমার পরে যে রাসূল আসবে আহমদ নামে, তার সুসংবাদদাতা। অতঃপর সে যখন তাদের

কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এলো তারা বললো, এ তো স্পষ্ট যাদু।'

১০. মির্জা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীদের আকীদা– হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী অবাস্তব এবং মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

১১. মির্জা সাহেব বলেন, জিহাদ একটি অমানুষিক বর্বরতাপূর্ণ কাজ। তাই কাফিরদের সাথে মোকাবিলা করা, জিহাদ করা আমার উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার ধারণা, বৃটিশ সরকারের সহযোগিতা করা এবং জিহাদের অমানুষিক বর্বরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য।

১২. কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.)-এর যাবতীয় মুজেযা তথা মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে সুস্থ করা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। তারা বলে, কলিকাতা এবং বোম্বাইতে এ ধরনের খেলাধুলা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। সুতরাং ঈসা (আ.) কর্তৃক সংঘটিত কাজগুলো অলৌকিক কোন বিষয় নয়।

১৩. কিয়ামতের দিন শিঙায় ফুঁ দেয়ার পর মৃত লোকেরা কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জমা হবে, এ কথাটি কাদিয়ানী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না। তারা বলে, মৃত্যুর পরই জান্নাতী লোক জান্নাতে এবং জাহান্নামী লোক জাহান্নামে চলে যায়। তাই কিয়ামতের দিন কাউকে জান্নাত এবং জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। তবে এদিনে তাদেরকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত করা হবে। হাশর বলতে এ কথাই মূলত বুঝানো হয়েছে।

১৪. কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আকীদা– আরওয়াহে কাওয়াকিবের অপর নামই হল ফিরিশতা। তারা নিজস্ব স্থান ছেড়ে কখনো এ পৃথিবীতে পদার্পণ করার ক্ষমতা রাখে না। হযরত জিবরাঈলও এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে সক্ষম নয়। নক্ষত্রাত্মার জ্যোতিষ্কের এক অলৌকিক প্রভাবের নামই হল নুযুলে-ওহী।

১৫. মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার প্রণীত কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বহু অপবাদ দিয়েছে এবং বহু স্থানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহীকে মিথ্যা বলে দাবী করেছে।

১৬. কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আকীদা– হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাকে জীবিত মনে করা শিরক। কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো

তিনি এ পৃথিবীতে আসবেন না। কিয়ামতের পূর্বে এ পৃথিবীতে যে ঈসা ইবন মারয়ামের আগমনবার্তা কিতাবে পাওয়া যায়, আমিই হলাম সে ঈসা ইবন মারয়াম।

১৭. মির্জা সাহেব বলেন– দাজ্জাল খৃষ্টান পাদ্রীদেরই একটি দল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ হল রাশিয়ার এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। আর আমিই হলাম মসীহে মাওউদ।

পর্যালোচনা

১. ইসলামের আকীদা : কুরআন ও হাদীসের আলোকে কাদিয়ানীদের উপরোল্লিখিত সকল আকীদাই ভ্রান্ত ও ইসলামবিরোধী। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। সমস্ত জিন ও মানুষ এবং সারা জাহানের জন্য হল তাঁর নবুওয়ত। এই বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীতে এবং এই ধরনের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যে তিনি নবীদের মধ্যে আফযল এবং শ্রেষ্ঠ। তাঁর রিসালাত এবং নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। নবুওয়াতী সিলসিলার পরিসমাপ্তি তাঁর দ্বারাই হয়েছে। তাঁর পর থেকে নবুওয়াতের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিই হল কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত। তাই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং কাদিয়ানী সম্প্রদায় হল মুরতাদ, যিন্দিক, মুলহিদ এবং কাফির।

২. হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর থেকে ওহীর দরোজা চিরতরে বন্ধ। অন্য কারো নিকট ওহী আসার আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবুওয়াতের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিই হল কাফির এবং মুরতাদ।

৩. কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের নাজাত এবং সফলতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ ওহীর উপরই নির্ভরশীল। হুযুরের পর কোনো ওহীই মাদারে নাজাত নয় বা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবুওয়াত বা রিসালাতের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তিই ইসলামের দায়েরা এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর কারো থেকে কোন মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং মির্জা সাহেবের মুজিযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা থেকে কস্মিনকালেও অধিক হতে পারে না।

৬. এ সৃষ্টি জগতের মধ্যে কেউই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমতুল্য নয়। সুতরাং মির্জা সাহেব কি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রেষ্ঠ হবেন? এ কখনো হতেই পারে না।

৭. এ উম্মতের কোন ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। অ-নবীর শ্রেষ্ঠত্ব নবীর উপর, এ কোনক্রমেই হতে পারে না।

৮. নবীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ফরয। তাঁদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা কুফরী।

৯. নিম্নবর্ণিত আয়াতের মিসদাক একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এ আয়াতে আহমদ বলে তাঁকেই বুঝানো হয়েছে।

'এবং (স্মরণ করুন সেই ঘটনা) যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল– হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল, তোমাদের নিকট পূর্ব হতে যে তাওরাত রয়েছে তার সমর্থক এবং আমার পরে যে রাসূল আসবে আহমদ নামে, তার সুসংবাদদাতা। অতঃপর সে যখন তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এলো তারা বললো– এ তো স্পষ্ট যাদু।'

১০. কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হতে পারে না।

১১. কুরআনে বর্ণিত জিহাদের হুকুম এক পবিত্র ও প্রয়োজনীয় হুকুম। জিহাদ মুসলমানদের জন্য ফরয। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে তা কিয়ামত পর্যন্তই ফরয হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে।

১২. আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-এর বহু মুজেযার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এর মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত মৃতকে জীবিত করা, মৃত্তিকা

থেকে পাখি সৃষ্টি করা এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করার ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে সত্য এবং সুপ্রসিদ্ধ। এগুলোর সততা এবং হক্কানিয়্যাত সম্পর্কে আমরা সকলেই আস্থাশীল।

১৩. কিয়ামতের দিন শিঙায় ফুঁক দেয়ার পর এ জমিন-আসমান, পাহাড়-পর্বত সবকিছুই তুলার মত উড়তে থাকবে। মানুষ কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানে জমা হবে। এখানে তাদের হিসাব-নিকাশ হবে। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবীদের নিকট ছুটাছুটি করতে থাকবে। কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবেন না। সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বহু জাহান্নামী মানুষকে তিনি সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। সে পুলসিরাত কায়েম করা হবে। সকলেই এর উপর দিয়ে অতিরাহিত হবে। ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

১৪. ফিরিশতা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল এক সম্মানিত মাখলুক। তারা নূরের তৈরি, তারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। আল্লাহর হুকুম পালনার্থে তারা কখনো এ জমিনে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহী বাহক। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন।

১৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অপবাদকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী মিথ্যা হওয়ার দাবীদার ব্যক্তি কাফির এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত।

১৬. আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)কে অভিশপ্ত ইহুদী সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করে জীবিত অবস্থায় তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি এখনও জীবিত। কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় এ পৃথিবীতে তাশরিফ আনবেন।

১৭. দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানই এ আকীদা পোষণ করেন যে, ইহুদী নস্লের এক কানা ব্যক্তিই দাজ্জাল। তার অনুসারী সকলেই হবে ইহুদী, সে শেষ যুগে এ পৃথিবীতে এসে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। খোদায়ী দাবী করবে। হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার এসে তাকে হত্যা করবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ দুটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম। হযরত ঈসা

(আ.)-এর বদদুআয় তারা এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাদের মরা লাশের দুর্গন্ধে গোটা পৃথিবী তখন দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মির্জা সাহেবের মিথ্যাবাদী হওয়ার একটি আকর্ষণীয় কাহিনী

হুশয়ারপুর নিবাসী মির্জা আহমদ বেগের একটি মেয়ে ছিল। নাম ছিল তার মুহাম্মদী বেগম। মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য মির্জা সাহেব আহমদ বেগের নিকট পয়গাম পাঠায়। আহমদ বেগ তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন। বহু প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর মিথ্যাবাদী মির্জা গোলাম আহমদ শঠতা ও ধোকাবাজির আশ্রয় নেয়। সে বলতে থাকে, মুহাম্মদী বেগমের সাথে আমার বিবাহের বিষয়টি আমি ওহী এবং ইলহামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আল্লাহর নির্দেশেই আমি পয়গাম দিয়েছি। আল্লাহ বলেছেন, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদী বেগমের সাথে তোমার এ বিবাহ হবেই হবে। যদি তার পরিবারের লোকেরা এ পয়গামকে উপেক্ষা করে তাহলে মুহাম্মদী বেগমসহ পরিবারের সকলেই অসহ্যকর বিপদে আক্রান্ত হবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মির্জা সাহেব পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে এ কথাগুলো প্রচার করতে থাকেন। ধোকাবাজ-মিথ্যাবাদীর খপ্পর থেকে মেয়েকে বাঁচানোর লক্ষ্যে মির্জা আহমদ বেগ পাত্র খোঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রস্তাব এল সুলতান মুহম্মদ নামক এক যুবকের সম্পর্কে। আলোচনা চলছে মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে সম্পর্কে। এ সংবাদ শুনতে পেয়ে মির্জা সাহেব দারুণভাবে ক্ষেপে যান। নিজেকে সামাল দিতে না পেরে ইলহামের দোহাই দিয়ে মিথ্যাবাদী কাদিয়ানী বলতে থাকে– যদি মুহাম্মদী বেগমের সাথে সুলতান মুহাম্মদের বিবাহ হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর আল্লাহর গযব অনিবার্য। আর এ গযবেই খতম হবে সুলতান মুহাম্মদ আড়াই বছর পর এবং মির্জা আহমদ বেগ তিন বছর পর। অতএব, ইলহাম এবং ওহীর দোহাই দেয়া সত্ত্বেও মির্জা গোলাম আহমদ তাদেরকে কোন রকমেই আটকিয়ে রাখতে পারলো না। মিথ্যা ওহীর গোলক ধাঁধার তোয়াক্কা না করে সুলতান মুহাম্মদ মুহাম্মদী বেগমকে বিয়ে করে নেয় অবশেষে। বিবাহের পর চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পর মির্জা সাহেবের ভণ্ডামী ধরা পড়ে যায় সকলের নিকট। বিপাকে পড়ে যায় ভণ্ড নবী মির্জা

গোলাম আহমদ। ভক্তদের নিকট ধরা পড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকায় পুনরায় প্রচার করতে থাকে মির্জা সাহেব মিথ্যা ইলহাম ও মিথ্যা ওহীর কথা। এবার তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন– যদিও মুহাম্মদী বেগমের সাথে সুলতান মুহাম্মদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং এতে তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী লোকেরা খুশি উদযাপন করছে, তথাপিও তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি নিজেই তাদেরকে পরাজিত করা এবং তোমার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যথেষ্ট। স্মরণ রাখবে, সুলতান মুহাম্মদ তোমার জীবদ্দশায়ই মারা যাবে এবং এরপর মুহাম্মদী বেগম তোমার নিকাহতে আসবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া সত্ত্বেও তার জীবনে মুহাম্মদী বেগমের চরণ দুটো দেখে যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল না। অবশেষে মুহাম্মদী বেগমের জ্বলন্ত প্রেম নিয়ে সুলতান মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদী বেগমের আগেই তাকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। অভিশপ্ত কাফির মির্জা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পরও আল্লাহর মর্জিতে সুলতান মুহাম্মদ প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর বেঁচে থাকেন।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কত বড় দাজ্জাল, কায্যাব এবং মিথ্যাবাদী ছিল উল্লেখিত ঘটনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের সকল উলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হল কাফির, মুরতাদ, মুলহিদ, যিন্দিক, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ, প্রবঞ্চক এবং ধর্মত্যাগী। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা মুসলমান মাত্র সকলের জন্যই ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

পারভেযী মতবাদ বা ফিতনায়ে ইন্‌কারে হাদীস

ইসলামের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী চক্রান্তের অংশ হিসাবে কুচক্রী মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার দলবল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিফাযতে কুরআন এবং আদালতে সাহাবা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। তারাই প্রথমে হাদীসের উপর কুঠারাঘাত করে এবং আহলে বায়ত ছাড়া অন্য সকল সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করে। এরপর সিফ্‌ফীনের ময়দানে সালিশ নির্ধারণ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাদীস অস্বীকার করার ব্যাপারে নতুন আরেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইসলামের ইতিহাসে এরা খারিজী সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত। এ সম্প্রদায় তাহকীম বা সালিশে বিশ্বাসী সকল সাহাবীকে কাফির ফতোয়া দিয়ে তাদের বর্ণিত সকল রিওয়ায়েত এবং হাদীসসমূহকে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়। এদের মোকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করে রাফিযী ও শীয়া সম্প্রদায়। তারা কুরআনে কারীম বিকৃত এ দাবী উত্থাপন করার সাথে সাথে নবী পরিবার ব্যতীত অন্য সকল সাহাবীর রেওয়ায়েতকে অনির্ভরযোগ্য বলে এসব হাদীসের প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ করে এবং দীনকে নিজেদের ইমামগণের অনুসরণ ও অনুকরণের মাঝে সীমাবদ্ধ বলে প্রচার করতে থাকে। এ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম তার নিজস্ব গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে বিভিন্ন চিন্তাধারার, বিভিন্ন আকীদার, বিভিন্ন মাযহাবের বিভিন্নপন্থী লোক। এ কারণে তদানীন্তনকালে মুসলিম সমাজে কতিপয় মানব মেধা প্রসূত যুক্তিবিদ্যাগত জটিলতা দেখা দেয়। উত্থাপিত হয় কিছু দার্শনিক প্রশ্ন। সীমিত জ্ঞানের কারণে এসব সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কতিপয় লোক হাশর-নশর, আল্লাহর দর্শন, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম অনুরূপ আরো অনেক কিছু কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস তথা শরীয়তের মৌলিক চার দলীলের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে বসে। ফলে সংযোজন হয় মুনকিরীনে হাদীসের তালিকায় আরেকটি দলের। ইসলামের ইতিহাসে এ দলটিই মুতাযিলা সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

মুনকিরীনে হাদীসের এ সব ফিতনা চিরতরে স্তব্ধ করে মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মুহাদ্দিসীন, মুজাদ্দিদীন ও ফুকাহায়ে উম্মত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তাদের এ অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম বন্ধ হয়ে যায়, নস্যাৎ হয়ে যায় তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও সমুদয় কারসাজি। তখন থেকে নিয়ে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ফিতনা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি কোথাও। তবে ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে খৃষ্টান জগত যখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা যখন তাদের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল, পরাজয়ের গ্লানি যখন তাদেরকে উস্‌কে দিচ্ছিল তখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে লড়াই করার সাহস না পেয়ে তারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। দাঁড় করায় অরিয়েন্টালিস্টদের এক বিরাট দল। তারা ইসলাহে মাযহাব, ইসলাহে দীনে ইসলাম, সায়েন্টিফিক রিচার্স ও ইসলামে নতুন সংস্কার প্রভৃতির নামে কায়েম করে বহু সংস্থা ও সংগঠন। উদ্দেশ্য হল, মনীষীদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করে দেয়া, ইসলামের মৌলিক আকীদায় কুঠারাঘাত করা এবং ইসলামের এ অগ্রযাত্রাকে ব্যর্থ করে দেয়া।

অভিশপ্ত অরিয়েন্টালিস্ট সম্প্রদায়ের লিটারেচার ও তাদের ক্ষুরধার লিখনির সামনে নতজানু হয়ে এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে মুসলিম নামধারী তথাকথিত প্রগতিশীল কতিপয় লোক তাদের এ পদক্ষেপকে মুবারকবাদ জানায় এবং সর্বাত্মকভাবে তাদের সাথে প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা চালিয়ে যেতে থাকে। মূলত ভারত উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ পুষ্ট এ আন্দোলনকে সর্বপ্রথম মুবারকবাদ এবং শুভাগমন জানিয়েছিলেন জনাব স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার সাথী মৌলভী মুহাম্মদ চেরাগ আলী। তারাই এ উপমহাদেশে ইনকারে হাদীসের বীজ বপন করার লক্ষ্যে এমন এমন পুস্তক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন যার প্রতিটি অক্ষর থেকে গোলামী এবং দাসত্বমূলক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ পথ ধরেই জনাব স্যার সৈয়দ আহমদ খান জান্নাত, জাহান্নাম, জিন, ফিরিশতা, মুজিযা এবং অলৌকিক ঘটনাবলীকে অস্বীকার করে সুদ এবং পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে মুসলিম সমাজে চালু করার চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন।

এরপর ক্রমান্বয়ে আবদুল্লাহ চকড়ালুভী, আসলাম জারাজপুরী, মৌলভী

আহমদ দীন আমরসতরী, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সাম্রাজ্যবাদীদের আজ্ঞাবহ গোলাম হিসাবে এ ফিতনার নেতৃত্ব দিয়েছেন বলিষ্ঠভাবে। পরিশেষে এ সব গোমরাহী, যালালাত এবং খুরাফাতের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে আবির্ভূত হন গোলাম আহমদ পারভেয। তারই নেতৃত্বে এ ফিতনার প্রচার, প্রসার এবং ইশাআত হয়েছে সর্বাধিক বেশি। তার লিখিত পুস্তক বর্তমান যুব সমাজকে করে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত। হাদীস অস্বীকার করা, হাদীস সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, হাদীসের প্রতি উপহাস করা এবং পরিহাস করা, হাদীসের অপব্যাখ্যা দেয়া প্রভৃতি বদদীনি কাজগুলো আজ তাদেরই দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে এবং এর পেছনে রয়েছে তাদেরই কালো হাত। হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতা এবং এ ইরতিদাদী সয়লাব মূলত তিনটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। নিম্নে এগুলোর বিবরণ পেশ করা হল :

১. হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের দাবী হল– ওহীয়ে মাতলু বা কুরআন শরীফই হল একমাত্র ওহী। ওহীয়ে গায়রে মাতলু তথা হাদীস শরীফ কোন ওহীই নয়। কুরআনের তাবলীগ এবং কুরআন প্রচার ও প্রসারই হল একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব। কুরআনের অনুসরণ এবং অনুকরণই কেবল আমাদের জন্য ওয়াজিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ না সাহাবীদের জন্য ওয়াজিব ছিল, না বর্তমানে আমাদের জন্য ওয়াজিব। অধিকন্তু তাদের দাবী হল, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ, কুরআনকে আল্লাহ তাআলা সহজ ভাষায় নাযিল করেছেন। কুরআন পাঠ করে যে কোন মানুষই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং বুঝতে পারে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সমস্ত সাহাবীর জন্য হুজ্জত ও দলীল হিসাবে গণ্য ছিল। কিন্তু তাঁর এ বাণী আমাদের জন্য হুজ্জত ও দলীল হিসাবে গণ্য নয়।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জত এবং নাজাতের অন্যতম উপায় হিসাবে মেনে নিলেও আমাদের সামনে বিদ্যমান হাদীসসমূহ যেহেতু কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেনি তাই আমরা এ সমস্ত হাদীস মানার জন্য মুকাল্লাফ বা বাধ্য নই।

কর্মপন্থা

হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাকে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং সর্বসাধারণকে এ গলদ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ধাবিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় অপকৌশল অবলম্বন করে। কয়েকটি অপকৌশলের বর্ণনা উদাহরণস্বরূপ নিম্নে পেশ করলাম।

- কুরআন মজলুম ও নির্যাতিত এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত গোটা উম্মত কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি– এ সব কথা প্রচার করার পাশাপাশি নিজেদেরকে কুরআনের সঠিক সমঝদার এবং ধীমান চিন্তাবিদ হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করা।
- কুরআন ও হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য প্রমাণ করে মানুষের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করা যে, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা নয়। বরং বিপরীত দুই মেরুতে অবস্থিত পরস্পর মুখালিফ দুটি গ্রন্থ।
- কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।
- পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত ভ্রান্ত মতাদর্শগুলোকে ইসলামী মতাদর্শ হিসাবে সমাজে চালু করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
- বিভিন্ন মাযহাবের ফুরূঈ এবং আঙ্গিক ইখতিলাফকে মৌলিক ইখতিলাফে পরিণত করে এ কথা প্রমাণ করা যে, হাদীসই হল এসব ইখতিলাফ এবং বিচ্ছিন্নতার একমাত্র কারণ। যদি এগুলোকে জ্বালিয়ে ভষ্মীভূত করা যায় (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে লেশমাত্র ইখতিলাফও আমাদের মাঝে আর থাকবে না।
- যুক্তিবহির্ভূত কোন জিনিসই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই অলৌকিক ঘটনাবলীও আমাদের জন্য অলীক, অবাস্তব এবং কল্পনাপ্রসূত কাহিনী।
- বুযুর্গানেদীন, আকাবিরে উম্মত, সলফে সালেহীন এবং পূর্বসূরি আলিমদের লোভী, মিথ্যাবাদী, দালাল ইত্যাদি প্রমাণ করা, তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, তাদের সমালোচনার লক্ষ্যরূপে নিরূপন করা এবং তাদের প্রতি এমন আচরণ করা যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়ে যায় এবং মানুষ তাদেরকে অনির্ভরযোগ্য বলে ধারণা করতে থাকে।

- ইসলামের মৌলিক আহকাম, আকায়েদ, ইবাদত, মুআমালাত প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করা।
- সুস্পষ্ট ইবাদত ও নুসূসের মাঝে তাহরীফ করা এবং এগুলোর ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- হাওয়ালা বা বরাত দেয়ার ক্ষেত্রে ইবারত কাটছাঁট করে পেশ করা এবং গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে অসম্পূর্ণ ইবারত নকল করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবনের ঘটনাগুলো নকল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের উপর অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার অপবাদ আরোপ করে সর্বসাধারণের নিকট এ কথা প্রচার করা যে, এ সমস্ত অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সম্বলিত গ্রন্থাদি আমাদের জন্য কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহকে বাদ দিয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, গল্প এবং কাহিনীর পুস্তকাদি থেকে ঘটনাবলী মানুষের সামনে হরহামেশা বয়ান করা।

অরিয়েন্টালিস্ট সম্প্রদায় শুধু দীনের কোন অংশের মাঝে নয়, শুধু কোন হুকুমের মধ্যে নয়, শুধু কোন একটি হাদীসের ব্যাপারে নয়; বরং গোটা শরীয়ত তথা ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত, সিয়াসাত প্রভৃতি বিষয়কে তারা নিজেদের মনগড়া তাহরীফ এবং বিকৃতির লক্ষ্যরূপে নিরূপণ করে নিয়েছে। যাতে মানুষ এ সব লেখা পড়ে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে দীন থেকে মুনহারিফ হয়ে যায় বা দীন থেকে বিমুখ হয়ে যায়। বর্তমান যুগে হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় নিম্ন বর্ণিত দাবীগুলো পোষণ করছে :

- আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্থ হল মারাকাযে মিল্লাত বা ধর্মীয় কেন্দ্র এবং উলুল আমর-এর মর্ম হল অধীনস্থ অফিসারবৃন্দ।
- আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের অর্থ হল– মারকাযী হুকুমত বা কেন্দ্রীয় হুকুমতের আনুগত্য।
- খতমে নবুওয়াতের অর্থ– বর্তমানে বিপ্লব কোন ব্যক্তির হাতে নেই। বরং চিন্তা-ভাবনা এবং কল্পনার মাধ্যমেই এ বিপ্লব সাধিত হবে। আর

মানব সভ্যতার বাগডোরও কোন ব্যক্তির ক্ষমতায় নেই বরং মানব সভ্যতা নিযাম এবং সিস্টেমের সাথেই তা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

- উত্তরাধিকারী সম্পদ, ঋণ, লেনদেন, সাদকা-খয়রাত ইত্যাকার বিষয়গুলো প্রাথমিক যুগের সাথে সম্পর্কিত, বর্তমান যুগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।
- খোদা ঐ সমস্ত উন্নত গুণাবলীর নাম যা মানুষ নিজের মাঝে আনয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হরহামেশা।
- জান্নাত ও জাহান্নাম নিকৃষ্ট কোন স্থানের নাম নয়। বরং এ হল মানুষের একটি কাইফিয়াত বা অবস্থার নাম।
- কুরআন অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের দৃষ্টি রাখার জোর দাবী জানিয়েছে। এরই নাম হল ঈমান বিল আখেরাত।
- ফিরিশতা বলে আভ্যন্তরীণভাবে মানুষের মনের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। মূলত পৃথকভাবে মালাইকা বা ফিরিশতার কোন অস্তিত্ব নেই।
- জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসা আদম নির্ধারিত কোন ব্যক্তি নয়। বরং এ হল ইনসানিয়্যাতের এক তামছীলী নুমায়েন্দা বা প্রতীকী প্রতিনিধি।
- কুরআন ব্যতীত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর কোন মুজিযা দেয়া হয়নি।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিরাজ স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয়েছে স্ব-শরীরে নয়। আর যদি স্ব-শরীরে হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে আমরা বলব যে, এ ঘটনা মূলত হিজরতেরই ঘটনা। হিজরতের ঘটনাকেই মিরাজের ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফে মসজিদে নববীকেই মসজিদে আকসা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- কুরআন শরীফে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং নামায কায়েম করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- ইসলামী হুকুমতের পক্ষ হতে আরোপিত ট্যাক্সই হল মূলত যাকাত। শরীয়তের পক্ষ হতে এর কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রাষ্ট্রের তরফ থেকে নির্ধারিত করাকেই কুরআন শরীফে সাদকা বলে অভিহিত করা হয়েছে।
- হজ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এর উদ্দেশ্য হল, কুরআনের আলোকে গোটা মুসলিম বিশ্বের সার্বিক সমস্যার সমাধান করা।
- আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে সমবেত জনতার খাওয়া দাওয়ার সুব্যবস্থা করার লক্ষ্যেই কুরআনে কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটাই হল কুরবানীর হাকীকত। না বুঝে কুরআন পড়লে সওয়াব হয় কথাটি একেবারে অনৈসলামিক আকীদাপ্রসূত কথা।
- কুরআনের দৃষ্টিতে শুধু মৃত জানোয়ার, প্রবাহিত খুন, শূকরের গোশত এবং গায়রুল্লাহর নামে জবেহকৃত জানোয়ারই কেবল হারাম। এ ছাড়া আর কোন কিছু খাওয়া বা ভক্ষণ করা হারাম নয়।

পর্যালোচনা

মানুষের জ্ঞান সসীম। এ সসীম ও সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম ও অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার পরিচিতি লাভ করা এবং নিজেকে সুপথে পরিচালিত করা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াত এবং রাহনুমায়ীর জন্য নাযিল করেছেন বিশুদ্ধতম জ্ঞানের উৎস তথা ওহীর এক সুমহান সিলসিলা। এ আসমানী হিদায়েত এবং নির্দেশনার আলোকে মানবতার শিক্ষা এবং সুষ্ঠু তরবিয়্যতের জন্য পাঠিয়েছেন তিনি যুগে যুগে বহু নবী এবং রাসূল। তাঁরা আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছার বাইরে কোন কথা বলেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

'সে মনগড়া কোন কথা বলে না। এ তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' [নজম : ৩-৪ আয়াত]

মূলত ওহী দুই প্রকার। প্রথমটিকে বলা হয় ওহীয়ে মাতলু বা কালামুল্লাহ। আর অপরটিকে বলা হয় ওহীয়ে গায়ের মাতলু বা কালামুর রাসূল। যেমনিভাবে কালামুল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এর অনুকরণ করা

আমাদের জন্য ফরয, অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি আদেশ-নিষেধের উপর আমল করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য কয়েকটি দলিল নিম্নে পেশ করলাম।

১. পয়গামে ইলাহী আল্লাহ তাআলা কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হৃদয়ে ইলক্বা করেছেন, আবার কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে পৌঁছিয়েছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) কখনো আল্লাহরই নির্দেশ মুতাবেক আল্লাহর মূল বক্তব্যকে নিজের ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো আল্লাহর শিখানো শব্দ এবং বাক্যসমূহকে হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখানো ও সংরক্ষিত শব্দসমূহকে যা হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়েছেন এটাকেই ওহীয়ে মাতলু বলা হয়। আর বাকী অন্যগুলোকে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলা হয়। এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ তাআলা বলেন–

'মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা- ৫১ আয়াত]

২. আকীদায়ে তৌহিদের পর নামাযই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল। মি'রাজের ঘটনার অনেক পূর্ব থেকেই মুসলমানগণ সকাল ও সন্ধ্যায় দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। অথচ প্রচলিত সূরাতে নামায আদায় করার নির্দেশ ঐ সময় পর্যন্ত কুরআনে কোথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবীগণ শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের উপর ভিত্তি করেই এ আমল তখন আরম্ভ করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ওহীয়ে মাতলুর মত ওহীয়ে গায়র মাতলুও অনুসরণীয় এবং উম্মতের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

৩. কুরআন শরীফে ইকামতে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রচলিত নামায তথা তাকবীরে তাহরীমা, কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা, বৈঠক ইত্যাদি ওয়ালা নামাযের তালীম কুরআনে কোথায়ও নেই। বরং প্রচলিত

পদ্ধতিতে নামায আদায় করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ও আমলের দ্বারাই ছাবিত হয়েছে। এর দ্বারাও ওহীয়ে গায়র মাতলু উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে।

৪. পবিত্রতা নামাযের জন্য পূর্বশর্ত। এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথমে বয়ান করেছেন। অবশ্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনার ১৮ বছর পর গোসল সম্পর্কিত সূরায়ে মাঈদার আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এর দ্বারাও ওহীয়ে গায়র মাতলু হুজ্জত হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারছি।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর মুসলমানদেরকে মসজিদে আকসার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ ১৬-১৭ মাস এদিকে ফিরে নামায পড়ার পর আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে পড়ার নির্দেশ দেন। অথচ মসজিদে আকসার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ কুরআনে কোথায়ও নেই। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মসজিদে আকসার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ ওহীয়ে গায়র মাতলুর মাধ্যমেই প্রদান করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ পাক এ ঘোষণাকে নিজের ঘোষণা বলে কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন–

'এ যাবত তুমি যে কিবলার অনুসরণ করছিলে, তা এ উদ্দেশ্যেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।' [সূরা বাকারা : ১৪৩ আয়াত]

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওহীয়ে গায়র মাতলুও ওহীরই একটি প্রকার।

৬. বনী নযীর গোত্রের ইহুদীদের সাথে লড়াই চলাকালে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গাছপালা কেটে ফেলার জন্য মুসলিম বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেন। এ কাণ্ড দেখে ইহুদীরা যখন হৈ চৈ আরম্ভ করে তখন আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কাজের বৈধতার সমর্থনে আয়াত নাযিল করে বললেন–
'তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছ, তা তো কেবল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; তা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। [হাশর : ৫ আয়াত]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমেও ওহীয়ে মাতলুর হুজজিয়্যাত এবং ওহীয়ে গায়র মাতলুও মূলত ওহীরই এক প্রকার– এ কথাই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। 'শুধু কুরআনের তাবলীগ করাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্ব' হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৌলিক দায়িত্ব কি? বিষয়টির বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

'তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, সে তার আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।' [আল ইমরান : ১৬৪ আয়াত]

'কুরআনের ফাহ্ম এবং কুরআনের বিশুদ্ধতম সমঝ হাদীসের উপর নির্ভরশীল নয়' কথাটিও একেবারে অবাস্তব। কারণ নামায রোযা হজ যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের আসল রূপরেখা আমরা হাদীস থেকেই সংগ্রহ করেছি। তাই জনৈক মুহাদ্দিস বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝা ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেছেন, হাদীস ব্যতীত কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করাও সম্ভব নয় এবং আমল করাও সম্ভব নয়।

'হাদীস না সাহাবীদের জন্য অনুসরণীয় ছিল এবং না আমাদের জন্য অনুসরণীয়' দাবীটি একেবারেই অসম্ভব। কারণ, নবীদেরকে ইলাহী নেগাহবানী ও কড়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিপালিত করে মাসুম এবং নিষ্পাপ রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য হল তাঁদেরকে তৎকালীন উম্মতের জন্য উসওয়া বা আদর্শরূপে গড়ে তোলা। যে আদর্শ অনুসরণ এবং অনুকরণ ব্যতীত মুক্তির বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। এ মহাসত্যটিকে প্রকাশ করার লক্ষ্যেই কুরআন ঘোষণা করেছে– 'আমি এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হয়।' [সূরা নিসা : ৬৪]

শুধু তাই নয়, বরং বিশ্ব স্রষ্টা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করাকে খোদা নিজের আনুগত্য বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– 'কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।' [সূরা নিসা : ৮০]

এমনকি আল্লাহর ভালবাসা লাভের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য হল পূর্বশর্ত। এ শর্তটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ বলেছেন– 'বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ও দয়ালু।' [সূরা আল ইমরান : ৩১]

রাসূলের ইতাআত ব্যতীত মুসলমান হওয়াও সম্ভব নয়। তাই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে কুরআন বারবার ঘোষণা করেছে– 'বল, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।' [সূরা আল ইমরান : ৩২]

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। ইরশাদ হয়েছে– 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই মূলত সফলকাম।' [সূরা নূর : আয়াত ৫২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যই হিদায়েত লাভের অন্যতম উপায়। এ দিকে জোর দিয়ে আল্লাহ বলেছেন– 'বল, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং তোমরা তাঁর (রাসূলের) আনুগত্য করলে সৎপথ লাভ করবে, রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।' [সূরা নূর : ৫৪]

আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে কুরআন বারবার বলেছে– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি লুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' [সূরা আনফাল : আয়াত ৪৬]

নামায ও যাকাতের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন– 'সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার।' [সূরা নূর : আয়াত ৫৬]

কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয় বরং পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। অন্যথায় পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

'কিন্তু না, তোমাদের প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে। অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।' [সূরা নিসা : আয়াত ৬৫]

অধিকন্তু হাদীস অমান্যকারী ব্যক্তির ঠিকানা জাহান্নাম। এ সম্পর্কে কুরআন নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেছে- 'কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!' [সূরা নিসা : ১১৫]

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সাহাবীদের জন্য হুজ্জত আমাদের জন্য হুজ্জত নয়'- হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের এ দাবীটিও যুক্তিহীন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্বনবী, কিয়ামত পর্যন্তের জন্য নবী এবং গোটা বিশ্ব ধরিত্রীর জন্য নবী। তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমানই গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের ব্যাপকতা গোটা বিশ্বব্যাপী। এ বিষয়টির প্রতি দিক নির্দেশনা করে জোরকণ্ঠে কুরআন বলছে- 'বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।' [সূরা আরাফ : আয়াত ১৫৮]

কুরআন আরো বলছে-

'আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [সূরা সাবা : আয়াত ২৮]

আরো বর্ণিত আছে- 'আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।' [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১০৭]

আরো ইরশাদ হয়েছে- 'কত মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন

অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জাহানের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।' [সূরা ফুরকান : আয়াত ১]

'রাসূলের হাদীস বিশ্ববাসীর জন্য হুজ্জত। তবে বর্তমান হাদীস ভাণ্ডার যেহেতু কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেনি তাই আমরা এ সব হাদীস মানার জন্য বাধ্য নই'– হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের এ দৃষ্টিভঙ্গিও সহীহ নয়। কারণ, 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক'– এ আয়াতে আল্লাহ পাক শব্দগত দিক থেকে কুরআনের হিফাযতের প্রতিশ্রুতি দেয়ার সাথে সাথে অর্থ ও ব্যাখ্যার দিক থেকেও এর হিফাযতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মৌলিকভাবে। কারণ, শব্দ এবং অর্থ উভয়ের নামই হল কুরআন। আর হাদীসের মধ্যে মূলত কুরআনের অর্থকেই প্রকাশ করা হয়েছে সর্বোত্তভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তেইশ বছরের জিন্দেগী হল কুরআনের আমলী নমুনা এবং কুরআনের এক জীবন্ত মিছাল। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, কুরআনই হল তাঁর আখলাক।

বিদআতী সয়লাব

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বিষয়কে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেননি, যে সমস্ত বিষয়ের তাঁরা নির্দেশ দেননি সেগুলোকে দীনের কাজ বলে নির্ধারণ করা, এর অঙ্গ বলে ঘোষণা দেয়া, সওয়াব এবং নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কোন আমল করা, শরীয়তের কোন নির্দেশ ও আমলের পাবন্দীর মত এ ধরনের কাজের স্বকপোল কল্পিত রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে নিয়ে সেগুলোর পাবন্দী করা, এ ধরনের সবকিছুই বিদআত বলে গণ্য। বিদআত মূলত আল্লাহর নির্ভেজাল দীনের মাঝে মানবকল্পিত তথাকথিত নয়া এক শরীয়তের উদ্ভব ঘটানোরই নামান্তর। এ যেন নির্ভেজালের মাঝে ভেজালের সংমিশ্রণ এবং এক রাষ্ট্রের ভেতরে অপর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানোর মত। এ সমস্ত কল্পিত শরীয়ত ও রীতির রয়েছে আলাদা ফিকাহ ও স্বতন্ত্র ব্যবহার মাত্র। এর করণীয়, এর ফরয, ওয়াজিব, এর সুন্নত-মুস্তাহাব সবকিছুই আলাদা। আল্লাহর দীনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ জামাতের কর্ণধার ছিলেন জনাব আহমদ রেযা খান। রেযা খানীদের চাকচিক্যময় আকর্ষণীয়

শ্লোগানে অল্পবিদ্যাসম্পন্ন বহু সাদাসিধে মুসলমান-এ সয়লাবে ভেসে চলছে দারুণভাবে এবং ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বিদআতী ফিতনা এগিয়ে চলছে।

মৌলিকভাবে বিদআতী ফিতনা চারটি মৌল আকীদার উপর নির্ভরশীল :

১. বিদআতীদের আকীদা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাতি নূরের তৈরি। তিনি বশর নন।

২. রিযাখানীদের বিশ্বাস : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানেন।

৩. বিদআতী সম্প্রদায়ের ধারণা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্রই হাজির-নাজির।

৪. তাদের আকীদা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুখতারে কুল অর্থাৎ এ পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে। আল্লাহর হাতে কোন ক্ষমতা নেই। এ ছাড়াও কবরপূজা, মাজার পূজা, কবরে শিরনী দেয়া, কবরে আলোকসজ্জা করা, কবরে গিলাফ দেয়া, মিলাদে কিয়াম করা ইত্যাদি তাদেরই বাড়াবাড়ির অন্যতম ফসল। বস্তুত আল্লাহর দীনের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা

১. কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ, তিনি বশরিয়্যাতের উর্ধ্বে নন। তবে তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তিনি হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট মহামানব। তিনিই হচ্ছেন নবীদের সর্দার এবং নবী জামাতের দলপতি। আল্লাহর পর তাঁরই মর্যাদা, তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নবীর মত তিনিও ধন্য হয়েছেন আল্লাহর প্রত্যাদেশ পেয়ে। মর্যাদার দিক থেকে কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহর পর সম্মানিত তুমিই হে রাসূল! সংক্ষেপে এ কথাই আমরা তাঁর সম্পর্কে বলতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ কি না, বাস্তবতার নিরীখে এর সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে কুরআন ঘোষণা করেছে–

'বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়

যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' [সূরা কাহফ : ১১০]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যে পরিমাণ ইলম দান করেছেন, অন্য কাউকে তিনি সে পরিমাণ ইলম দান করেননি। সৃষ্টি জগতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তের ইলম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞান সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতই মাত্র; এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

তাই 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ব জানেন' এ কথা বলা ঠিক নয়। কারণ, গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এ মহাসত্যটির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত করে মহাগ্রন্থ আল কুরআন বলছে– 'বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে যে, কখন তারা পুনুরুত্থিত হবে।' [সূরা নামল : আয়াত ৬৫]

অদৃশ্যের খবরপত্র তালাবদ্ধ কুঠরীতে আবদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এর আসল তথ্য। তাই আল্লাহ বলেন– 'তাঁরই নিকট রয়েছে অদৃশ্যের কুঞ্জি, তিনি ব্যতীত কেউ জানে না এ সম্পর্কে আর।' [সূরা আনআম : ৫৯]

তিনি আরো বলেছেন– 'বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' [সূরা আ'রাফ : ১৮৮]

৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির-নাজির নন। কারণ, হাজির-নাজির শব্দ দুটি আরবী। এর দ্বারা এমন এক সত্তাকেই বুঝান হয় যিনি সর্বদা ও সর্বত্র বিরাজমান এবং যিনি সম্যক দ্রষ্টা। এ কেবল আল্লাহ তাআলারই শান এবং তাঁরই এক বিশেষ গুণ। এ গুণের অধিকারী হওয়া আল্লাহ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ চিরসত্য কথাটিকেই অংকন করে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ বলেছেন– 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।' [সূরা হাদীদ : ৪]

এ আয়াতে আল্লাহ যেন একই কথা বলতে চাচ্ছেন যে, সর্বদা সর্বত্র বিরাজ থাকা এবং সমস্ত কিছুর প্রত্যক্ষভাবে নেগরানী করা বা দেখাশোনা করা এ আমারই কেবল খাস সিফাত এবং আমারই এক বিশেষ গুণ। তোমরা যতই কিছু হও না কেন, এ গুণের অধিকারী হতে পারবে না কেউ। ইফকের ঘটনা, মধু পান করার ঘটনা, বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত ভক্ষণ করার ঘটনা প্রভৃতি ঘটনাবলী 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বদা ও সর্বত্র হাজির-নাজির নন' এ বিষয়টির প্রতিই জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। অধিকন্তু উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইযাম 'আল্লাহু হাজিরী এবং আল্লাহু নাজিরী' অযীফা আদায় করে দৈনন্দিন এ কথাই ঘোষণা করে আসছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হাজির-নাজির নন। তিনিই হলেন এ গুণে গুণান্বিত এক অদ্বিতীয় সত্তা।

৪. মুখতারেকুল বা এ পৃথিবীর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন। বিশ্ব জাহানের সুষ্ঠু প্রতিপালন এবং পরিচালনাও কেবল তাঁরই হাতে। সকল বস্তুর উপর তিনিই একমাত্র ক্ষমতাশালী। এ নিখিল বিশ্বের শৃঙ্খলা বিধান ও সবকিছুর প্রতিপালনে কেউ বা কোন কিছুই তাঁর শরীক নেই। তিনি যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না। চাওয়া পাওয়ার একমাত্র আশ্রয়স্থল তিনিই। তকদীর, ভাল ও মন্দ সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। এ কারণেই হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে আগত সকল নবী-রাসূলই তাঁর দরবারে আরাধনা, প্রার্থনা ও মুনাজাত জানিয়েছেন এবং তাঁকেই সকলে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণের মূল মালিক বলে মেনে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে লক্ষ্য করে) ইরশাদ করেছেন–

'হে বৎস! আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ কর, তবে আল্লাহও তোমার হক সংরক্ষণ করবেন। যদি তুমি হুকুকুল্লাহ'র হিফাযত কর তাহলে আল্লাহকে তুমি নিজের সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন তুমি আল্লাহর নিকট চাইবে আর যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। মনে রাখবে, যদি সমস্ত মানুষও একত্রিত হয়

তোমাকে উপকার করার জন্য তাহলে তারা আল্লাহর মর্জির বাইরে তোমাকে কিছুই উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ একত্রিত হয় তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তাহলে তারাও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার বাইরে।' [মেশকাত শরীফ : ৪৫৩]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম ভাষ্যকার বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেছেন, মাখলুক একেবারে অসহায়। এ নিতান্তই অক্ষম। হিফাযত-হালাকাত, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, রোগ-শোক, উপকার-অপকার, হায়াত-মউত, ধন-দৌলত, রিযক-কসমত ইত্যাদি কোন কিছুই তার হাতে নেই। সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তবে মাঝে মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ হতে দেখে নবী-রাসূলদেরকে খোদায়িত্বের শরীক করা এবং তাঁদেরকে মুখতারে কুল বলে মনে করা চরম বোকামী এবং ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, অলৌকিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো কোন নবী-রাসূলের আয়ত্বাধীন নয়। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

'যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না, তারা বলে– অন্য এক কুরআন এছাড়া, অথবা এটাকে বদলাও। বল, নিজ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা ওহী হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে আমি আশংকা করি মাহদিবসের শাস্তি।' [সূরা ইউনুস : ৫]

তাই মুজিযা বা অলৌকিকতার বহিঃপ্রকাশের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখতারে কুল বলে মনে করা খৃষ্টান মতবাদেরই নামান্তর। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য এ ধরনের আকীদা পোষণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়।

বিদআতের কুফল কুরআন ও হাদীসের আলোকে

ইসলাম একটি মুকাম্মাল জীবন বিধান। সওয়াবের নিয়তে এতে নতুন কিছু আবিষ্কার করা শিরক। এ শিরক তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– 'তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।' [সূরা রূম : ৩১-৩২]

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ মূলত বিদআতীদের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে।

বিদআতী সম্প্রদায় যতই আমল করুক না কেন, এ আমল তাদের জন্য কোন কল্যাণ নিয়ে আসবে না কখনো। বরং ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ততাই হল এ আমলের নিশ্চিত পরিণাম। এ পরিণামটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আল কুরআন বলেছে–

'বল, আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? এরাই তারা, যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে গিয়েছে পার্থিব জীবনে, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।' [সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪]

দীন চিরন্তন; অর্থাৎ সকল যুগ এবং সকল স্থানে এর আমল ও বিধানসমূহের রূপ একই। এ চিরন্তনতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে বিদআত থেকে বেঁচে থেকে সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার বলিষ্ঠ তাগিদ দিয়ে জোরকণ্ঠে বলেছেন– 'যদি কেউ আমাদের এ দীনে নয়া কোন বিষয়ের উদ্ভাবন করে যা মূলত এতে নেই, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত।' [বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

অন্য এক হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'তোমরা বিদআত থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম।' [আবু দাউদ, আহমদ]

আলো আর অন্ধকারের মাঝে যেমন বৈপরীত্য, তেমনিভাবে সুন্নাত ও বিদআতের মাঝেও বৈপরীত্য। এ কারণে বিদআত যে পরিমাণে হতে থাকে, সুন্নাতও সে পরিমাণে সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে। এ হিকমতপূর্ণ কথাটির প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

যখন কিছু সংখ্যক লোক দীনের বিষয়ে কোন বিদআতের প্রবর্তন করে পরিণামে তখন সে অনুপাতে সুন্নাতসমূহেরও অবশ্যই বিলুপ্তি ঘটে। [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

বিদআতী ব্যক্তি চরমভাবে অভিশপ্ত এ কথাটি চিহ্নিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যখন আমার উম্মতের মাঝে বিদআতের উদ্ভব ঘটবে এবং আমার সাহাবীদেরকে যখন (লোকেরা) গালমন্দ বলা আরম্ভ করবে তখন আলেমের জন্য উচিত হল নিজের ইলমকে প্রকাশ করে দেয়া। যদি সে তা না করে তাহলে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত, ফিরিশতার লা'নত এবং সমস্ত মানুষের লা'নত।' [আল ইতিসাম]

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর নিকট গেল এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল সে ইসলাম ধ্বংস করার পথে সহযোগিতা করল। [আল ইতিসাম]

বিদআত সম্পর্কে মনীষীদের বাণী

সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীতে ইমাম, ফকীহ, মুজাদ্দিদ, সংস্কারক এবং আল্লাহওয়ালা আলিমে দীনগণ সব সময়ই স্ব স্ব যুগের বিদআত ও প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর মুকাবিলা করেছেন। ইসলামী সমাজ এবং ধর্মীয় পরিবেশসমূহে এ সমস্ত বিদআতের প্রচলন ও গ্রহণীয় হওয়ার মারাত্মক প্রবণতাকে রুখবার তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফতোয়া আজো এর জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে। তিনি বলেছেন–

'যে ব্যক্তি ইসলামের মাঝে বিদআতের প্রচলন করে সে মূলত এ কথাই বলতে চাচ্ছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালাত ও মানুষকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে (নাউযুবিল্লাহ) খিয়ানত করেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমাদের দীন আমি তোমাদের জন্য

পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। সুতরাং যে সমস্ত বিষয় তখন দীন হিসাবে গণ্য ছিল না আজ তা দীন হিসাবে গণ্য হতে পারে না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা বিদআত করবে না, ইবাদতে অতিরঞ্জিত করবে না, আকাবিরদের পথ আঁকড়ে ধর এবং যে বিষয়টিকে সুন্নত জান তাকে অবলম্বন কর আর যে বিষয়টিকে সুন্নত বলে তোমার জানা নেই তা বর্জন কর।

হযরত আবু আমর শায়বানী (রা.) বলেছেন, বিদআতী ব্যক্তির জীবনে তাওবা নসীব হয় না। কারণ, সে তো গুনাহকে গুনাহই মনে করে না। তার জন্য আবার তাওবা কিসের?

হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিদআতী লোকের সাথে উঠাবসা করে তার হিকমত নসীব হয় না।

বিদআতের অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম সর্বদাই সতর্ক ছিলেন। তাঁদের এ সতর্ক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ সাধারণ মানুষ বিদআতের চাকচিক্যময়তার প্রভাব থেকে কখনো মুক্ত থাকতে পারেননি। কারণ, কিছু সংখ্যক দুনিয়াদার ধর্ম ব্যবসায়ী তথাকথিত ধর্মীয় আলখেল্লাধারী ব্যক্তি নিজেদের জাগতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সর্বদাই লোকদেরকে বিদআতের এ ভয়াল পথে পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের এ ঘৃণিত পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে আল কুরআন বলছে–

'হে ঈমানদারগণ! (ইহুদী ও খৃষ্টান) পণ্ডিত ও সাধুদের অধিকাংশই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে আর আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখে।' [সূরা তাওবা : আয়াত ৩৪]

সুতরাং বিদআতের এ ভয়াবহতা এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে বিদআতীদের সঙ্গ বর্জন করে হক্কানী আলিমদের সোহবত অবলম্বন করতে হবে এবং সাথে সাথে সুন্নাতের আমলও অত্যন্ত ইহতিমামের সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে।

মওদুদী ফিতনা

জনাব আবুল আলা মওদুদী একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি সনদপ্রাপ্ত মাওলানা এবং দীনি ইলমে সুশিক্ষিত ব্যক্তি নন। তিনি হচ্ছেন একজন স্বঘোষিত মাওলানা। পাশ্চাত্য বস্তুবাদের ব্যাপক হামলা থেকে ইসলামকে হিফাযত করার নামে তার ক্ষুরধার লিখনি আধুনিক যুক্তিবিদ্যার লাগামহীন পথ ধরে এমন বেপরোয়াভাবে পরিচালিত হয়েছে, যার ফলে ইসলামের মৌল প্রাসাদটি এক বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং ধসে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। কারণ, তার কলম যেমনিভাবে বস্তুবাদী অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে অনুরূপভাবে দীন ও দীনদার লোকদের বিরুদ্ধেও তা পরিচালিত হয়েছে ক্ষিপ্তভাবে। মোট কথা, আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ ডাক্তারের বেপরোয়া অপারেশনের ফলে রোগীর যে গুরুদশা হয় তার হাতেও ঠিক ইসলামের অনুরূপ অবস্থাই হয়েছে। কোন কোন বুযুর্গের মতে এ ফিতনা কাদিয়ানীদের চেয়েও আরো মারাত্মক। নিম্ন বর্ণিত কতিপয় বিষয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মওদুদী ফিতনা :

১. আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)।

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

৩. সলফে সালেহীন ও আকাবিরে দীন।

৪. মুজাদ্দিদীনে উম্মত।

৫. ইসলামী উলুম।

৬. আত্মম্ভরিতা।

৭. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবহার।

৮. কুরআন শরীফ।

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)

নবীগণ সকলেই মাসুম, তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ। ছোট বড় কোন গুনাহই তাঁদের থেকে হয়নি– এই হলো ইসলামী আকীদা। তবে বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াতের নিশানবরদার জনাব আবুল আলা মওদুদী ইসলামের বদ্ধমূল এ আকীদার উপর কুঠারাঘাত করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর চিরন্তন শিক্ষাকে পদদলিত করে আম্বিয়ায়ে কেরামের এ পূত পবিত্র মহান জামাতের প্রতি কলংক লেপন করার উদ্দেশ্যে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলেছেন, যা কোন মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা সম্ভব নয়। তিনি প্রসিদ্ধ নবী হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলেছেন–

◗ হযরত দাউদ (আ.) তৎকালীন যুগে ইসরাঈলী সোসাইটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে আওরিয়ার নিকট তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। [তাফহীমাত ২য় খণ্ড : ৪২ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ]

◗ হযরত দাউদ (আ.)-এর কাজের মধ্যে নফস এবং আভ্যন্তরীণ কুপ্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথেও তার কিছুটা সম্পর্ক ছিল। আর তা এমন একটি কাজকে কেন্দ্র করে হয়েছিল যা কোন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপতির জন্যও শোভনীয় নয়। [তাফহীমুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, সূরা সাদ ৩৭২ পৃ., ১ম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৬ ইং]

◗ হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে মাওলানা বলেছেন, অনেক সময় নফসের কোন নাজুক বিষয়ে নবীর ন্যায় উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন মানুষও মানবীয় দুর্বলতার সামনে ক্ষণিকের জন্য পরাভূত হয়ে পড়েন। তবে আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, যে ছেলে হককে বর্জন করে বাতিলের পথ ধরেছে, তাকে নিজ ঔরসজাত হওয়ার দরুন আপন মনে করা জযবায়ে জাহিলিয়াত বা মূর্খতা সুলভ আবেগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, তখন সে নিজের মনের গতিকে উপেক্ষা করে ইসলামী তাকাযার দিকে ফিরে আসে। [তাফহীমূল কুরআন : ২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃ. তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪ ইং]

◗ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বাণী– 'আমাকে মিসরের রাজকোষের পরিচালক নিয়োগ করুন'– এ কথাটি বলে হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু

অর্থমন্ত্রী হওয়ার জন্যই প্রার্থনা করেননি। যেমন- কারো কারো ধারণা, বরং তিনি এ বলে ডিকটিটরীই চেয়েছিলেন মৌলিকভাবে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান ইটালীর মধ্যে মুসোলিনির যে মর্যাদা তিনিও এর কাছাকাছি মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। [তাফহীমাত : ২য় খণ্ড, ১২২ পৃ. ৫ম সংস্করণ ১৯৭০ ইং]

◗ হযরত ইউনুস (আ.) থেকে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে কিছু দুর্বলতা হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত তিনি ধৈর্যহারা হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। [তাফহীমুল কুরআন : ২য় খণ্ড : সূরা ইউনুস, ৩১২-৩১২ টীকা, পৃ., ৩য় সংস্করণ ১৯৬৪ ইং]

◗ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না অতিমানব ছিলেন এবং না তিনি মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে ছিলেন। [তরজুমানুল কুরআন : ৮৫ খণ্ড ১৯৭৬ ইং, এপ্রিল সংখ্যা : ইসলাম কিছ চীয কা আলম বরদার হায় শীর্ষক প্রবন্ধ]

◗ জনাব মওদুদী সাহেব তাফহীমাত ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, পবিত্রতা নবীগণের জাতিগত অপরিহার্য গুণ নয়; বরং নবুওয়াতের দায়িত্ব যাতে তাঁরা সঠিকভাবে আদায় করতে পারে এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভুলত্রুটি থেকে হেফাযত করেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো কখনো নবীদের থেকে ইসমতের পর্দা উঠিয়েও নিয়েছেন যাতে মানুষ তাঁদেরকে খোদা বলে মনে না করেন এবং যাতে লোকেরা এ কথা জানতে পারে যে, তাঁরা মানব বিশেষ খোদা নন। অথচ ইসলামের বিশ্বাস হলো ইসমত বা পাপমুক্ততা নবীগণের অপরিহার্য গুণ। শরীরের রঙ যেমন শরীর থেকে পৃথক হয় না তেমনি ইসমত বা পাপমুক্ততার গুণ নবীগণ থেকে কোন সময় পৃথক হয় না।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)

আম্বিয়ায়ে কেরামের পর সাহাবীগণই হলেন এ উম্মতের সর্বাধিক সম্মানিত মানুষ। এ পূত পবিত্রতম মহান জামাতও মওদুদী সাহেবের কটাক্ষ এবং শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই পাননি। এ মহান জামাতের প্রতি কটাক্ষ করে মাওলানা তার লিখিত গ্রন্থ তাজদীদ ও ইহয়ায়েদীন, খিলাফত ও

মুলকিয়্যাত এবং তাফহীমুল কুরআনে যেসব মন্তব্য করেছেন উদাহরণস্বরূপ নিম্নে এর কয়েকটির বিবরণ পেশ করা হলো :

◗ জনাব মওদুদী সাহেব বলেন, সাহাবীগণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাঁদের দোষ বর্ণনা করা যায়। সাহাবীদের সম্মান করার জন্য এ যদি জরুরি মনে করা হয় যে, কোনভাবেই তাঁদের দোষ বর্ণনা করা যাবে না, তাহলে আমার দৃষ্টিতে এ ধারণা মোটেই সম্মান নয়; বরং এ তো মূর্তিপূজারই নামান্তর, যার মূলোৎপাটনের জন্য জামাআতে ইসলামীর জন্ম। [তরজুমানুল কুরআন : ৩৫শ' সংখ্যা : ৩২৭ পৃ.]

◗ জনাব মওদুদী হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বলেন, কিন্তু বদকিসমতের কারণে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনি (রা.) উক্ত (হযরত উমরের নির্বাচন পদ্ধতি) মানদণ্ডকে কায়েম রাখতে পারেননি। [খিলাফত ওয়া মুলুকিয়্যাত : ৯২ পৃ., ৫ম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ হযরত উসমান গনি (রা.) যাঁর উপর খিলাফতের বিরাট গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তিনি ঐ সমস্ত গুণাবলী মণ্ডিত ছিলেন না যা তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলীফার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাঁর খিলাফতকালে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মাঝে জাহিলিয়াতের অনুপ্রবেশ করার বিরাট সুযোগ মিলে যায়। [তাজদীদে ইহয়ায়ে দীন : আ. মান্নান তালিব কৃত অনুবাদ : ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ১ম সংস্করণ : জাহিলিয়াতের আক্রমণ শিরোনাম ১৯৬৬ ইং]

◗ হযরত উসমান গনি (রা.) খলীফা নির্বাচিত হবার পর ধীরে ধীরে তিনি পূর্ব নির্ধারিত পলিসি থেকে দূরে সরে যান এবং নিজের নিকটাত্মীয় লোকদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করতে শুরু করেন। অধিকন্তু তিনি তাদের সাথে এমন (স্বজনপ্রীতিমূলক) আচরণ করতে আরম্ভ করেন যা জনসাধারণের মনে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে রূপান্তরিত হয়। [খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত : ৯৭ পৃ. ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ এর চেয়েও মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিষয়টি ছিল এই যে, (হযরত উসমান গনি (রা.) কর্তৃক) মারওয়ান ইবনুল হাকামকে খলীফার সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত করা। কারণ, মারওয়ান হযরত উসমানের নরম মিজাযের সুযোগে এমন এমন কাজ করেছেন যার যিম্মাদারী এবং দোষ মৌলিকভাবে হযরত উসমানের ঘাড়েই আপতিত হয়। [খিলাফত ওয়া মুলুকিয়াত : ১০৬ পৃ. ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ হযরত উসমান গনি (রা.)-এর পলিসির এ দিকটি সন্দেহাতীতভাবেই গলদ ছিল। গলদ গলদই বটে, তা যে কেউ-ই করুক না কেন, অহেতুকভাবে বানাওয়াট করে একে সহীহ এবং সঠিক সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা আকল-ইনসাফের তাকাযাও নয় এবং ধর্মীয় চাহিদাও নয় যে কোন সাহাবীর গলদকে গলদ না মানা। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১০৭ পৃ. ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

ওহী সংকলনকারী সাহাবী হযরত মুআবিয়া সম্পর্কে জনাব মওদুদী বলেছেন–

◗ হযরত মুআবিয়ার যমানায় আর একটি ঘৃণিত জঘন্য বিদআত এই শুরু হয়েছিল যে, তিনি নিজে এবং তাঁর আদেশে তাঁর সমস্ত গভর্নর মিসরে বসে হযরত আলী (রা.)-এর উপর গালি গালাজ এবং প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিতেন। এমনকি মসজিদে নববীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের উপর বসে ঠিক রওযা শরীফের সামনে হুযুরের পরম প্রিয়তম পাত্রকে গালি দেয়া হত। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১৬২ পৃ., ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ গনীমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রেও হযরত মুআবিয়া (রা.) কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১৬২ পৃ. ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ যিয়াদ ইবন সুময়্যাহকে নিজের ভাই বানিয়ে নেয়া, হযরত মুআবিয়ার ঐ সমস্ত কার্যকলাপেরই অন্তর্ভুক্ত যা তিনি রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেছেন। হযরত মুআবিয়ার এ কাজটি শরীয়ত স্বীকৃত একটি নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১৬২ পৃ., ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

◗ হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর গভর্নরদেরকে আইনের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং শরীয়ত মুতাবেক তাদের জুলুম ও অত্যাচারের বিচার করতে পরিষ্কার অস্বীকার করে দিয়েছেন। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১৬২ পৃ., ৫ম সংস্করণ ১৯৮৩ ইং]

◗ (হযরত আলীর পর) অবশেষে নবুওয়তের পদ্ধতির পরিচালিত খিলাফতের যমানা শেষ হয়ে আসে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে। এভাবে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামের পরিবর্তে আবার জাহিলিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর জাহিলিয়াত ক্যানসার ব্যাধির ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজ দেহে বাহু বিস্তার করতে থাকে। [ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ২৯ পৃ. প্রকাশকাল ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

◗ হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব মওদুদী সাহেব বলেছেন, নির্ভেজাল জাহিলিয়াত রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত্ত করে। নামে খিলাফত কিন্তু আসলে ছিল সেই রাজতন্ত্র যাকে খতম করার জন্য ইসলামের আগমন হয়েছিল। বাদশাহকে ইলাহ্ বলার হিম্মত কারুর ছিল না। তাই 'আস-সুলতানু যিল্লুল্লাহ'র বাহানা তালাশ করা হয়। আর এ বাহানায় 'ইলাহ' যে আনুগত্যের অধিকারী হন বাদশাহরাও তা লাভ করেন। এ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় আমীর উমরা, শাসকবর্গ, গভর্নরবৃন্দ, সেনাবাহিনী ও সমাজের কর্তৃত্বশালী লোকদের জীবনে কম বেশি নির্ভেজাল জাহিলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নৈতিক ভিত্তি ও সামাজিকতাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। [ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ৩০ পৃ. প্রকাশকাল ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

◗ হযরত মুআবিয়া এবং হযরত মুগীরা ইবন শোবা (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করে জনাব মওদুদী সাহেব বলেন যে, ইয়াযিদকে যুবরাজ নিয়োগ করার প্রাথমিক আন্দোলনটি মূলত কোন সহীহ্ জযবার উপর হয়নি। বরং এক বুযুর্গ স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের জন্য অপর এক বুযুর্গের ব্যক্তিগত ফায়দার উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাবের জন্ম দিয়েছেন। তারা ভেবেও দেখেননি যে, তারা এ উম্মতকে কোন পথে নিক্ষেপ করছেন। [খিলাফত ওয়া মুলূকিয়াত : ১৪১ পৃ. ৫ম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮৩ ইং]

অথচ ইবনে খালদুন ও ইবনে কাছীরের মত ঐতিহাসিকগণের তথ্যে জানা যায় যে, এ সবই ছিল হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর প্রতি আরোপিত অপবাদমাত্র।

সলফে সালিহীন ও আকাবিরেদীন

সাহাবায়ে কেরামের পূতঃপবিত্রতম জামাআত যেখানে জনাব মওদুদী সাহেবের শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই পাননি সেখানে সলফে সালিহীন, আকাবিরেদীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও সোলাহায়ে উম্মতও তার আক্রমণ থেকে কি করে রক্ষা পেতে পারেন? এ সমস্ত মনীষী সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

◗ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না এবং কারো যেহনী গোলামীতে আবদ্ধ হবে না; বরং প্রত্যেককে আল্লাহর নির্দেশিত পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠিতে যাচাই করবে এবং এ মাপকাঠি অনুপাতে যে যেই স্তরের প্রমাণিত হয় তাকে সেই স্তরেই রাখবে। [দস্তুরে জামাআতে ইসলামী : ৩ নং দফা, ৩৪ পৃ. : ৩য় সংস্করণ ১৯৬২ ইং]

◗ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ জনাব মওদুদী সাহেবের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। তাই নির্ভরযোগ্য লোক তৈরি করে সঠিক এবং সার্থক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি সলফে সালিহীন এবং আকাবিরদের (অনুসরণীয় পূর্বসূরিদের) সমালোচনা করে বলেন– শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৩ বছরের মধ্যে এ সমস্ত কার্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন। তারপর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমর ফারুক (রা.)-এর ন্যায় দু'জন আদর্শ নেতার নেতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য ইসলামের হয়। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় এ সর্বব্যাপী কাজের সিলসিলা জারি রাখেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে এর কর্তৃত্ব আসে এবং প্রথম প্রথম কয়েক বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি পূর্ণরূপে জারি থাকে। [তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীনের অনুবাদ, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ২৮ পৃ. প্রকাশকাল : ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

এরপর 'জাহিলিয়াতের আক্রমণ' শিরোনামে তিনি বলেন, কিন্তু একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্রুত বিস্তারের কারণে প্রতিদিন কাজ অধিকতর কঠিন হতে যাচ্ছিল এবং অন্যদিকে হযরত উসমান (রা.) যার উপর এ বিরাট কাজের বোঝা রক্ষিত হয়েছিল, তিনি তাঁর মহান পূর্বসূরিদের প্রদত্ত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না। তাই তাঁর খিলাফত আমলে ইসলামী

সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জাহিলিয়াত অনুপ্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। হযরত উসমান (রা.) নিজের শির দান করে এ বিপদের পথ রোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা রুদ্ধ হয়নি। অতঃপর হযরত আলী (রা.) অগ্রসর হন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে জাহিলিয়াতের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করার জন্য চরম প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তিনি জীবন দান করেও এই প্রতি বিপ্লবের পথ রোধ করতে পারেননি। অবশেষে নবুওয়াতের পদ্ধতির পরিচালিত খিলাফতের যামানা শেষ হয়ে আসে। স্বৈরচারী রাজতন্ত্র তার স্থান দখল করে। এভাবে রাষ্ট্রের বুনিয়াদ ইসলামের পরিবর্তে আবার জাহিলিয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর জাহিলিয়াত ক্যানসার ব্যাধির ন্যায় ধীরে ধীরে সমাজদেহে তার বাহু বিস্তার করতে থাকে। কেননা, কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এখন ইসলামের পরিবর্তে তার হাতে ছিল এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবার পর তার প্রভাবের অগ্রগতি রোধ করার ক্ষমতা ইসলামের ছিল না। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল এই যে, জাহিলিয়াত উলঙ্গ এবং আবরণমুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি; বরং মুসলমানের রূপ ধারণ করে এসেছিল। প্রকাশ্য নাস্তিক, মুশরিক বা কাফিরের মুখোমুখি হয়ে হয়তো মুকাবিলা করা সহজ হতো। কিন্তু সেখানে প্রথমেই ছিল তৌহিদের স্বীকৃতি। রিসালাতের স্বীকৃতি, নামায ও রোযা সম্পাদন এবং কুরআন ও হাদীস থেকে যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ, আর তার পেছনে জাহিলিয়াত নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। [তাজদীদ এ ইহইয়ায়ে দীনের অনুবাদ : ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ২৮-২৯ পৃ. প্রকাশকাল ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

এ সময় ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা কি হয়েছিল, এর চিত্র অংকন করে মাওলানা বলেছেন, জাহিলী নেতৃত্বের সিংহাসনে এবং রাজনীতির মসনদে 'মুসলমানের' সমাসীন হওয়া, জাহিলী শিক্ষায়তনে মুসলমানের শিক্ষকতা করা এবং জাহিলিয়াতের আসনে 'মুসলমানের' মুর্শিদ হিসাবে উপবেশন করা এক বিরাট প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। খুব কম লোকই এ প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারে।

এ প্রতি বিপ্লবের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক ছিল এই যে, ইসলামের আবরণে তিন ধরনের জাহিলিয়্যতই তাদের শিকড় গাড়তে শুরু করে এবং তাদের প্রভাব প্রতিদিন অধিকতর বিস্তার লাভ করতে থাকে।

১. নির্ভেজাল জাহিলিয়াত রাষ্ট্র ও সম্পদ করায়ত্ত করে। নামে খিলাফত কিন্তু আসলে ছিল সে রাজতন্ত্র, যাকে খতম করার জন্য ইসলামের আগমন হয়েছিল। বাদশাহকে ইলাহ বলার হিম্মত কারো ছিল না। তাই 'আস-সুলতানু যিল্লুল্লাহ'র বাহানা তালাশ করা হয়। আর এ বাহানায় 'ইলাহ' যে আনুগত্য লাভের অধিকারী হন বাদশাহরাও তার অধিকার লাভ করেন।

২. শিরক মিশ্রিত জাহিলিয়াত জনগণের উপর হামলা করে তাদেরকে তৌহিদের পথ থেকে সরিয়ে গোমরাহীর অসংখ্য পথে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। কেবলমাত্র সুস্পষ্ট মূর্তিপূজা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। নয় তো এমন কোনো ধরনের শিরক ছিল না যা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়নি।

৩. বৈরাগ্যবাদী জাহিলিয়াত– উলামা, মাশায়েখ, সুফী ও পরহেযগার লোকদের উপর হামলা করে এবং তাদের মধ্যে সেসব ক্রটি বিস্তার করতে থাকে (যেগুলোর দিকে আমি ইতোপূর্বেই ইশারা করেছি।)। এই জাহিলিয়াতের প্রভাবে মুসলিম সমাজে প্লেটুবাদী দর্শন, বৈরাগ্যবাদী চারিত্রিক আদর্শ এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে। এ জীবন দর্শনটি শুধু সাহিত্য ও জ্ঞান সাধনাকেই প্রভাবিত করেনি বরং প্রকৃতপক্ষে সমাজের সৎলোকদেরকে মরফিয়া ইনজেকশান দিয়ে স্থবিরত্বে পৌছিয়ে দিয়েছে, রাজতন্ত্রের জাহিলী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে জড়তা ও সংকীর্ণ চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং সমগ্র দীনদারকে কতিপয় বিশেষ ধর্মকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। [তাজদীদ এ ইহইয়ায়ে দীন : অনুবাদ ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ৩০-৩২ পৃ. প্রকাশকাল : ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

এরপর তিনি 'মুজাদ্দিদের প্রয়োজন' শিরোনামে বলেছেন–

এই তিন ধরনের জাহিলিয়াতের ভীড় থেকে ইসলামকে উদ্ধার করে পুনর্বার তাকে সবল ও সতেজ করার জন্য মুজাদ্দিদগণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। [তাজদীদ এ ইহইয়ায়ে দীন : অনুবাদ- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : প্রকাশকাল- ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

তবে মুজাদ্দিদের কাজ কি? এ বিষয়টি চিহ্নিত করে জনাব. মওদুদী বলেছেন–

মুজাদ্দিদের কাজের নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ উল্লেখযোগ্য :

১. নিজের পরিবেশের নির্ভুল চিত্রাংকন। ২. সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন। ৩. নিজের সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ। ৪. চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির প্রচেষ্টা। ৫. সক্রিয় সংস্কার প্রচেষ্টা। ৬. দীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করার প্রচেষ্টা। ৭. প্রতিরক্ষামূলক প্রচেষ্টা। ৮. ইসলামী ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। ৯. বিশ্বজনীন বিপ্লব সৃষ্টি।

এ নয়টি বিষয়ের ব্যাখ্যা করার পর তিনি বলেছেন, এ বিভাগগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রথম বিভাগ তিনটি অপরিহার্য। কিন্তু অবশিষ্ট ছয়টি বিভাগের প্রত্যেকটি মুজাদ্দিদ হবার জন্য অপরিহার্য শর্তের মধ্যে গণ্য নয়। বরং এগুলোর থেকে কোনো একটি, দুটি, তিনটি, চারটি বিভাগে উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করলে তাকে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের মুজাদ্দিদ আংশিক মুজাদ্দিদ হবেন। পূর্ণ মুজাদ্দিদ কেবল তিনিই হবেন, যিনি উল্লেখিত বিভাগের প্রত্যেকটিতে পূর্ণ কার্য সম্পাদন করে নবুওয়াতের উত্তরাধিকারিত্বের হক আদায় করবেন। এরপর তিনি কামিল মুজাদ্দিদের আগমন ঘটেছে কি না এবং তারা ওয়ারাছাতে নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন কি না? এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেছেন—

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখনো কোনো কামিল মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটেনি। হযরত উমর ইবন আবদুল আজীজ (রহ.) এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি। তারপর যত মুজাদ্দিদ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে কোন একটি বিশেষ বিভাগে অথবা একাধিক বিভাগে কাজ করেছেন। কামিল মুজাদ্দিদের স্থান এখনো শূন্য আছে। কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি, মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব পরিস্থিতি এমনি একজন নেতার জন্য দাবী করে। যিনি এ যুগে অথবা যুগের হাজারো আবর্তনের পর জন্মলাভ করতে পারেন। তাঁরই নাম ইমামুল মাহদী। [তাজদীদ এ ইহইয়ায়ে দীন : অনুবাদ- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ১৯-২১ পৃ. প্রকাশকাল : ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

মওদুদী সাহেব উম্মতের যে চিত্র অংকন করেছেন তা বিশ্লেষণ করে বুঝা যায়, এর মাধ্যমে তিনি এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সাহাবীদের প্রাথমিক যুগ থেকে নিয়েই ইসলামের উপর জাহিলিয়াতের আগ্রাসন চলে

আসছে। বাদশাহ ইলাহ হয়ে বসে আছে। জনসাধারণ শিরক মিশ্রিত জাহিলিয়াতের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। উলামা-মাশায়েখ সাধারণ লোকদেরকে মরফিয়া ইনজেকশান দিতে আরম্ভ করেছে। ইসলাম জাহিলিয়াতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ময়দানে দিশেহারা হয়ে ধুকে ধুকে মরছে। কিন্তু সাহাবী, তাবেঈ, ইমাম, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদ ও ফুকাহাদের থেকে কেউ অগ্রসর হয়ে আসেননি এহেন জাহিলিয়াতের খপ্পর থেকে উম্মতকে উদ্ধার করার জন্য এবং যথাযথভাবে ওয়ারাছাতে নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য। হয়তো বা তাঁরা জাহিলিয়াতের এজেন্টরূপে কাজ করেছেন নতুবা তাঁরা জাহিলিয়াতের প্রতারণায় নিজস্ব স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে ইসলাম তাদের নিকট দ্বিতীয় স্তরে নেমে এসেছে। তবে গোনাবাছা কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে কোন রকমে ইসলামী তালীমাতকে ধরে রেখেছেন। এ কথাটিই প্রকাশ করে তিনি বলেছেন–

১. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জাহিলিয়াতের হাতে, আর ইসলাম চলছে শুধু কেবল দ্বিতীয় স্তরে। ২. অথবা এখানে কয়েকজন এবং সেখানে কয়েকজন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে চলছে, অথচ সমষ্টিগতভাবে জীবনের এক ব্যাপক পরিধিতে ইসলাম ও জাহিলিয়াত মিশ্রিত হয়ে এক সাথে মিলে ঝুলে চলছে, প্রচলিত উভয় ব্যবস্থাই নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যের জন্য সহায়ক নয়। তাই দীনের জন্য প্রত্যেক যুগে এমন শক্তিশালী ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল এবং বর্তমানেও আছে যা বিকৃত এবং আদর্শবিবর্জিত জাতির গতি পাল্টিয়ে পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দিবে। [তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীন : ৪২ পৃ.]

জনাব মওদুদীর লেখায় এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর পঁচিশ বছর যেতে না যেতেই গোটা মুসলিম সমাজ নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যায়– এ চরম ঘৃণিত ও জঘন্যতম অপরাধ। এ বক্তব্যের পেছনে সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হল আসলাফ ও আকাবির সম্পর্কে ভবিষ্যত বংশধরদের মনে কুভাব ও খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা। এ জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তিনি এমন খেদমতই আঞ্জাম দিয়েছেন যা পূর্ববর্তীকালে শিয়া, রাফিযী ও

অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায় এবং পরবর্তীকালে কাদিয়ানী চক্রালোভী, পারভেযী, কমিউনিস্ট এবং সমস্ত নাস্তিক ও বস্তুবাদী লোকেরা আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

মুজাদ্দিদীনে উম্মত

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত মানব সমাজকে সুপথে আনয়নের জন্য এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে বহু মুজাদ্দিদ ও যুগ সংস্কারক পাঠিয়েছেন। এদের মধ্যে হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইবন হাম্বল, ইমাম গাযালী, ইমাম ইবন তায়মিয়্যা, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী, হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের তাজদীদী কারনামা সর্বজন স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও এ সমস্ত মনীষীগণ জনাব মওদুদী সাহেবের তীক্ষ্ণ আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ, যুগের সার্থক সংস্কারক জনাব উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন– 'হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (রহ.) এ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি।'

চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে বলেন– তাঁরা উসূলে দীন থেকে ইসলামের মৌলিক কানুনসমূহকে সুবিন্যস্ত করেছেন বটে কিন্তু তাঁরা আম্বিয়ায়ে কেরামের মিশনের জন্য কোন কাজই করে যাননি। অর্থাৎ যে কাজ অবশ্য করণীয় ছিল সে কাজে তাদের হস্ত স্পর্শও হয়নি।

দার্শনিক আলেম ইমাম গাযালী সম্পর্কে তিনি বলেন, ইমাম গাযালীর সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে কতিপয় তত্ত্ব ও চিন্তাগত ত্রুটিও ছিল। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল হবার কারণে তার কার্যাবলীতে এক ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। ২. দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি তার বুদ্ধিবৃত্তির উপর যুক্তিবাদিতা ও ন্যায়শাস্ত্রের কর্তৃত্বের কারণে সৃষ্টি হয়। ৩. আর তৃতীয় ধরনের ত্রুটির উৎপত্তি হয় তাসাউফের দিকে

তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার কারণে। [তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীন : অনুবাদ- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ৪৯ পৃ. প্রকাশকাল : ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

ইমাম গাযালীর পর আল্লামা ইবন তায়মিয়্যার পালা। আল্লামা ইবন তায়মিয়্যা সম্পর্কে মওদুদী সাহেব বলেন, তবুও সত্য যে, তিনি এমন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হননি যার ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সূচিত হতো এবং কর্তৃত্বের চাবিকাঠি জাহিলিয়াতের হাত থেকে ইসলামের হাতে স্থানান্তরিত হতো। [ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ৫৫ পৃ.]

এরপর তিনি মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেন–

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর যুগ থেকে নিয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ ও তাঁর প্রতিনিধিবৃন্দের সময় পর্যন্ত যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজে যে জিনিসটি প্রথম আমার চোখে বাধে তা হলো এই যে, তারা তাসাউফের ব্যাপারে মুসলমানদের রোগ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি এবং অজানিতভাবে তাদেরকে পুনর্বার সেই খাদ্য দান করেন যা থেকে তাদেরকে পূর্ণরূপে দূরে রাখার প্রয়োজন ছিল। তারা যে তাসাউফ পেশ করেন তার মূল কাঠামোর বিরুদ্ধে আমার কোন আপত্তি নেই; বরং প্রাণবস্তুর দিক থেকে তা ইসলামের আসল তাসাউফ। এ তাসাউফ 'ইহসান' থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। কিন্তু যে বস্তুটি আমি পরিত্যাজ্য বলছি তা হল তাসাউফের রূপক, উপমা ও ভাষা ব্যবহার এবং তাসাউফের সাথে সামঞ্জস্যশীল পদ্ধতি জারী রাখা। বলা বাহুল্য, সত্যিকার ইসলামী তাসাউফ এ বিশেষ খোলসের মুখাপেক্ষী নয়।

তাসাউফের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে জনাব মাওলানা এর কয়েক লাইন পর লিখছেন :

বর্তমান পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, কোন ব্যক্তি যতই নির্ভুল শিক্ষা দান করুক না কেন এ ছাঁচ ব্যবহার করার সাথে সাথেই শত শত বছরের প্রচলনের ফলে এর সাথে যে সব রোগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে সেগুলোর পুনরাবির্ভাব ঘটে। কাজেই পানির ন্যায় হালাল বস্তুও যেমন ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে রোগীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় অনুরূপভাবে এ

ছাঁচ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র এ কারণেই পরিত্যাজ্য যে, এরই আবরণে মুসলমানদের মধ্যে আফিমের নেশা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর নিকটবর্তী হতেই পুরাতন রোগীদের মানসপটে আবার সেই ঘুম পাড়ানীর কথা ভেসে উঠে যা শত শত বছর থেকে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তাদেরকে নিদ্রাভিভূত করেছে।

এরপর তিনি আরো বলেছেন–

মুসলমানদের এ রোগ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ অনবগত ছিলেন না। উভয়ের রচনায় এর সমালোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এ রোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে তাঁদের পূর্ণ ধারণা ছিল না। এ কারণেই তাঁরা এই রোগীদেরকে পুনর্বার এমন পথ্য দান করেন যা এই রোগে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ধীরে ধীরে আবার সেই পুরাতন রোগে আক্রান্ত হতে থাকে। যদিও মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ.) এ সত্য যথার্থরূপে উপলব্ধি করে ইমাম ইবন তায়মিয়্যার নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচনাবলীতে এর যথেষ্ট সাজ-সরঞ্জাম মজুদ ছিল। তাই শাহ ইসমাঈল শহীদের রচনাবলী এ থেকে প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। কাজেই সাইয়্যেদ আহমদের আন্দোলনেও পীর-মুরিদীর সিলসিলা চালু হয়ে গিয়েছিল। তাই সুফিবাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এ আন্দোলনও মুক্ত থাকতে পারেনি। এমনকি সাইয়্যেদ আহমদের শাহাদাত লাভের পরই তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এমন একটি দলের উদ্ভব হয় যারা শিয়াদের ন্যায় তার অদৃশ্য হবার কথা বিশ্বাস করেন এবং আজও তার পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছেন। [তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীন, অনুবাদ : ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন : ৮৬-৮৮ পৃ., প্রকাশকাল ৩১ জানুয়ারী ১৯৮০ ইং]

ইসলামী উলুম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান

জনাব মওদুদীর দৃষ্টিতে আকাবিরে উম্মত তথা পূর্বসূরি উলামায়ে কেরামের কেউ যেহেতু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন তাই তাদের সিলসিলায় আগত ইলমও তার নিকট কবুলিয়াতের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। পূর্বসূরি আকাবিরদের সিলসিলায় আগত ইলমের মাঝে 'নতুন ইজতিহাদের

প্রয়োজন' এ কথার প্রতি জোর দিয়ে তিনি ইসলামী উলুম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর যে কটাক্ষ করেছেন নমুনাস্বরূপ সংক্ষিপ্তাকারে পাঠক ভাইদের সামনে তা তুলে ধরলাম।

◗ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যার জন্য কোন তাফসীরের প্রয়োজন নেই। একজন উঁচু স্তরের প্রফেসরই এর জন্য যথেষ্ট, যিনি অত্যন্ত সুগভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেছেন এবং নতুন পদ্ধতিতে কুরআন পড়াতে ও বুঝাতে সক্ষম। তিনি নিজ বক্তৃতার মাধ্যমে আই,এ ক্লাসে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মাঝে কুরআন বুঝার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেন। এরপর বি,এ ক্লাসে তিনি ছাত্রদেরকে এমনভাবে কুরআন শিক্ষা দেবেন যাতে ছাত্ররা আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করার পাশাপাশি ইসলামের মূল প্রাণবস্তু সম্পর্কেও যথাযথ অবগতি লাভ করতে সক্ষম হবে। [তানকীহাত : ১৯৩ পৃ. ৪র্থ সংস্করণ]

◗ ইলমে হাদীস সম্পর্কে তাফহীমাত গ্রন্থে 'মাসলাকে ইতিদাল'-এর শিরোনামে ২৮৭ পৃষ্ঠা থেকে ২৯৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মওদুদীর একটি আলোচনা রয়েছে। এতে তিনি যে খিয়ালাত প্রকাশ করেছেন, এর মূল বক্তব্য হল এই যে, হাদীস সহীহ হওয়া মুহাদ্দিসগণের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তা মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিযাজ বুঝার উপর নির্ভরশীল।

◗ তিনি বলেন, হাদীস তো কতিপয় মানুষ হতে কতিপয় মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কাজেই এর সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বড় জোর ধারণা করা যেতে পারে। [তরজুমানুল কুরআন : রবিউল আউয়াল সংখ্যা : ১৩৬৫ হি.]

◗ মানুষের কাজের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মানুষ সংরক্ষিত নয়। সুতরাং এ কথা কি করে বলা যায় যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম যে হাদীসকে সহীহ বলে অবিহিত করেছেন, আসলেও তা সহীহ্? [তাফহীমাত : ২৯২ পৃ. ৪র্থ সংস্করণ]

◗ তাফসীর ও হাদীসের পর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইলমে ফিকাহ বা ফিকাহশাস্ত্রই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ের উপরও জনাব মওদুদীর কোন এতেমাদ ও আস্থা নেই। আছে শুধু ঘৃণা, নিন্দা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক কথা। ইলমে ফিকাহর তীব্র সমালোচনা করে 'হুকূকুয যাওজায়ন' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন–

◗ কিয়ামতের দিন গুনাহগার লোকদের সাথে তাদের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় লোকদেরকেও আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাদেরকে জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি এ জন্য প্রদান করেছি যে, তোমরা এর দ্বারা কোন কাজ নিবে না? আমার কিতাব এবং আমার নবীর সুন্নাত এ জন্যই কি তোমাদের নিকট ছিল যে, তোমরা এ নিয়ে কেবল ঘরের কোণায় বসে থাকবে আর অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায় গোমরাহী এবং বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হবে! আমি তো আমার দীনকে সহজ বানিয়ে ছিলাম, কি অধিকার ছিল তোমাদের এ দীনকে কঠিন বানানোর? আমি তো কেবল কুরআন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণের নির্দেশ দিয়েছিলাম, কে তোমাদের উপর ফরয করেছে এর থেকে অগ্রসর হয়ে আসলাফ ও আকাবিরদের অনুসরণ করার? সব সমস্যার সমাধান আমি কুরআনে দিয়েছি। কুরআনে হাত না লাগিয়ে মানব রচিত গ্রন্থাদিকে নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করার কে তোমাদের নির্দেশ দিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে কোন আলেম কানযুদ্দাকায়েক, হেদায়া এবং আলমগীরী গ্রন্থত্রয়ের লেখকবৃন্দের আশ্রয় নিতে পারবেন বলে আশা করা যায় না। তবে মূর্খ লোকদের তো এ জবাব দেয়ার অবশ্যই সুযোগ থেকে যাবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। [হুকুকুয্ যাওজায়ন : ৯৮ পৃ.]

◗ পুরাতন ফিকাহ্ অচল হয়ে গিয়েছে, নতুন ফিকাহর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। [তরজুমানুল কুরআন : ১৩৫৩ হিজরী]

আত্মম্ভরিতা

পূর্বসূরি আলিমদের প্রতি যেহেতু জনাব মওদুদী সাহেব আস্থাশীল নন, তাই তিনি দীনের ইফ্হাম ও তাফ্হীমও অনুধাবনের ক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং যোগ্যতার উপরই আস্থাশীল হতে বাধ্য হন। এ অবাস্তব বাহাদুরী ও আত্মম্ভরিতার শ্লোগান দিয়ে তিনি বলেন—

◗ আমি দীন বুঝবার জন্য ছোট বড় কোন আলেমের প্রতি মুহ্তাজ ও মুখাপেক্ষী নই। বরং আমি নিজেই কুরআন ও সুন্নাহ মন্থন করে দীনের মূল

উসূল এবং এ দেশের ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় লোকেরা কোন বিশেষ মাসআলাতে সহীহ পথ অবলম্বন করছেন, না গরল পথ অবলম্বন করছেন, তার তাহকীক ও বিশ্লেষণে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম। তাই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যে হকের আমি সন্ধান পাই তাই আমি হক হিসাবে বুঝি ও হক হিসাবে প্রকাশ করি। এ ক্ষেত্রে আমি যেন একেবারে মজবুর এবং নিতান্তই অপারগ। [রোয়েদাদে ইজতিমায়ে জামাতে ইসলামী, ইলাহবাদ : ৪৩ পৃ. তরজুমানুল কুরআন : মে সংখ্যা ১৯৪৬ ইং]

'দীনের কথা সনদ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়'– এ নীতির প্রতি চরম ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে তিনি বলেছেন–

◗ আমি দীন ইসলামকে বর্তমান কি অতীতের ব্যক্তিদের নিকট থেকে বুঝার চেষ্টা না করে সব সময়ই কুরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে বুঝার চেষ্টা করেছি। এ জন্য খোদার দীন আমার নিকট এবং অন্যান্য ঈমানদার ব্যক্তিদের নিকট কি দাবী করে তা জানার জন্য কোন বুযুর্গ ব্যক্তি কি করেন আর কি বলেন, সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করিনি। বরং আমি সর্বদাই কুরআন কি বলে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন এ কথাই বুঝার চেষ্টা করেছি সর্বাত্মকভাবে। [রোয়েদাদে জামাতে ইসলামী, ৩য় খণ্ড : ১০৬ পৃ. ৩য় সংস্করণ : মার্চ ১৯৬৩ ইং]

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

সলফে সালেহীন এবং আকাবিরদের উপর আস্থাশীল না হয়ে নিজ বুদ্ধিবৃত্তির উপর আস্থাশীল হওয়ার ফলশ্রুতিতে আকাবিরে উম্মত দীনকে যে আঙ্গিকে উপলব্ধি করেছিলেন জনাব মওদুদী এর থেকে ভিন্নতর পদ্ধতিতে দীনকে উপলব্ধি করেন। তাঁর নিকট একটি রাজনৈতিক আন্দোলনেরই নাম দীন ইসলাম, যা এ পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন–

◗ ইসলামী আন্দোলনের মাঝে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন এমন এক অদ্বিতীয় লীডার যাঁর জীবনে আন্দোলনের প্রাথমিক আহ্বান থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের রূপরেখা এবং এর

সংবিধান রচনা করা পর্যন্ত প্রতিটি দিক ও প্রতিটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

এ সময় (ইসলামী) আন্দোলনের লীডার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আন্দোলনের মূলনীতি এবং এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোও সুস্পষ্টভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তবে যে লীডারকে আল্লাহ রাহনুমায়ী এবং পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তিনি তৎকালীন পৃথিবী এবং নিজ দেশীয় সমস্যাবলীর থেকে কোন সমস্যার দিকেই মাথা উঁচু করে দেখেননি। তিনি তো কেবল আহ্বান জানিয়েছিলেন সমস্ত মনগড়া ইলাহকে বর্জন করে এক আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়ার জন্য। [ইসলামী হুকুমত কিস তরাহ কায়েম হুতি হায় : ২৩, ২৪, ৩২ পৃ.]

ইসলাম কি এবং মুসলমান কাকে বলে? এ সম্পর্কে এক নতুন তথ্য সংযোজন করে তিনি বলেন–

◗ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোন ধর্ম এবং মুসলমান কোন জাতি বিশেষের নাম নয়। বরং ইসলাম হল এক বৈপ্লবিক আহ্বান, মতাদর্শ ও বৈপ্লবিক মতবাদ। যা প্রচলিত সকল মতাদর্শকে উৎখাত করে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক এ পৃথিবীকে গড়ে তুলতে চায়। [তাফহীমাত : ৬২ পৃ.] (দ্র. ফিতনায়ে মওদুদিয়্যাত : ৪৪ পৃ.]

মওদুদীর নিকট রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করাই হল মূল ইবাদত। নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত হল ফৌজী ট্রেনিং এবং অনুশীলনের মত অনুশীলনী বৈ আর কিছু নয়। তিনি বলেছেন–

◗ এই হল ঐ ইবাদতের হাকীকত, যার সম্পর্কে মানুষ এ ধারণা পোষণ করে আসছে যে, নামায, রোযা, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিই হল একমাত্র ইবাদত। পার্থিব মু'আমালাত, লেনদেন ইত্যাদির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ নামায, রোযা, হজ, যাকাত, যিকর, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বিষয়গুলো এক বৃহৎ ইবাদতের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ট্রেনিং মাত্র। [তাফহীমাত : ৪র্থ সংস্করণ : ৫৬ পৃ.]

◗ ইবাদতের প্রতি তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, বিশেষ বিশেষ লোকেরা উল্টো পথ অবলম্বন করেন। অর্থাৎ তারা তাসবীহ ও মুসল্লা নিয়ে হুজরায় বসে যান। অথচ আল্লাহর বান্দাগণ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছে, দুনিয়ার মধ্যে

জুলুম ও অন্যায় সম্প্রসারিত হচ্ছে, বাতিলের অন্ধকার হকের আলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে, জালিম ও খোদাদ্রোহী লোকেরা জমিনের কর্তৃত্ব কেড়ে নিচ্ছে, খোদায়ী অনুশাসনের পরিবর্তে তাগুতী অনুশাসনের আনুগত্য করানো হচ্ছে। কিন্তু তারা নফলের পর নফল পড়ছে, তাসবীহর দানা টানছে আর 'হু' 'হক' বলে যিকরের লহরী তুলছে। এমনকি তারা শুধু কেবল তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হাদীস পাঠ করছে আর সীরাতে রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর জোরালো ভাষায় ওয়ায করছে। কিসসা-কাহিনী বয়ান করাই তাদের এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। তারা সত্যের প্রতি আহ্বান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর পথে লড়াই করার শিক্ষা না কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করছে, না রাসূলের সীরাত ও সাহাবীদের আদর্শ থেকে হাসিল করছে। এ কি ইবাদত? [তাফহীমাত : ৫৯ পৃ., ৪র্থ সংস্করণ ১৯৪৭ ইং]

জনাব মওদুদীর নিকট ইসলামের মূল প্রাণ হল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। তাই ইবাদত যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন যদি তা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক না হয় তাহলে এ ইবাদত তাঁর নিকট কোন ইবাদতই নয়। এ কারণে তিনি স্থানে স্থানে ইবাদতের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করেছেন। তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীন পুস্তকে জনাব আল্লামা সাহেব ইমাম মাহদী সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন–

মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মাহদীর আগমনের উপর বিশ্বাস রাখেন, তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের এ বিভ্রান্তি মাহদীর আগমনে অবিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুতাজাদ্দিদীন এর থেকে কোন অংশে কম নয়। তারা মনে করেন, ইমাম মাহদী পুরাতন যুগের কোন সুফী ধরনের লোক হবেন। তাসবীহ হাতে নিয়ে আকস্মিক কোন মাদ্রাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। বাইরে এসে 'আনাল মাহদী' 'আমিই মাহদী' বলে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেবেন। উলামা ও শায়খগণ কিতাব পত্র বগলে দাবিয়ে তার নিকট পৌঁছে যাবেন এবং লিখিত চিহ্নসমূহের সঙ্গে তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখে তাঁকে চিনে ফেলবেন। অতঃপর বায়আত গ্রহণ শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধনা সিদ্ধ দরবেশ এবং এ ধরনের গোড়া ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন, নেহাত শর্ত পূরণ করার জন্য নামমাত্র তলোয়ার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে সমস্ত কাজ বরকত

এবং রুহানী শক্তি বলেই সমাধা হয়ে যাবে। দুআ-দরূদ যিকর আযকার ও ফুৎকারের মাধ্যমেই ময়দান করায়ত্ব হবে। যে কাফিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সেই মুষড়ে পড়ে বেহুশ হয়ে যাবে এবং নিছক বদদুআর প্রভাবে ট্যাংক ও জঙ্গী বিমানসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাসীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যা অনুধাবন করছি তাতে দেখছি ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তাঁর নিজের যুগের একজন সম্পূর্ণ আধুনিক ধরনের নেতা হবেন। সমকালীন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি হবেন মুজতাহিদের ন্যায় গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, জীবনের সকল প্রধান সমস্যাকে তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করবেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত করবেন এবং সকল আধুনিকদের চাইতে বেশি আধুনিক প্রমাণিত হবেন। আমার আশংকা হয় তাঁর নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলভী ও সুফী সাহেবরাই সবার আগে চিৎকার শুরু করবেন। [তাজদীদে ইহইয়ায়ে দীন : ৫৫ পৃ. ৬ষ্ঠ সংস্করণ : মার্চ ১৯৫৫ ইং]

কুরআন শরীফ

মুক্ত মুতালাআ বা মুক্ত অধ্যয়নের প্রবক্তা জনাব আবুল আলা মওদুদী সাহেব দীনের অন্যতম উৎস কুরআন শরীফ সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করেছেন যার ফলে হিফাযতে কুরআনের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার উপর এক জটিল অভিযোগ আপতিত হয়। নিম্নে মাওলানার আলোচনা থেকেই এ কথার প্রমাণ পেশ করছি—

কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করার জন্য পরিভাষা চতুষ্টয় (ইলাহ, রব, দীন, ইবাদত)-এর সঠিক এবং পরিপূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা একান্তভাবে অপরিহার্য। ইলাহ, রব শব্দের অর্থ কি, ইবাদতের সংজ্ঞা কি, দীন কাকে বলে, কোন ব্যক্তি যদি তা না জানে তবে তার কাছে সম্পূর্ণ কুরআনই অর্থহীন হয়ে পড়বে। সে তাওহীদ জানতে পারবে না, শিরক বুঝতে পারবে না, ইবাদতকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করতে পারবে না এবং দীনকে করতে পারবে না আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে কারো মানসপটে যদি এ পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ

থাকে, তবে তার জন্য কুরআনের গোটা শিক্ষাই হবে অস্পষ্ট। কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও তার আকীদা এবং আমল বিশ্বাস বা ধর্ম উভয়ই থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। সে মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' বলবে আর তা সত্ত্বেও অনেককে ইলাহ বানাতে থাকবে। 'আল্লাহ ছাড়া কোন রব নেই' এ কথা মুখে ঘোষণা করলেও কার্যত অনেকেই তার রব সেজে বসবে। সে একান্ত নেক নিয়তের সাথে বলবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরো অনেক মাবুদের ইবাদতে মশগুল থাকবে। সে একান্ত জোর দিয়ে বলবে, আমি আল্লাহর দীনে আছি। অন্য কোন দীনে আছে বলে বলা হলে সে লড়াই করতে উদ্যত হবে। [কুরআন কী চার বুনয়াদী ইসতিলাহেঁ : ৯-১০ পৃ.]

এরপর তিনি 'ভুল ধারণার মূল কারণ' শিরোনামে বলেছেন–

আরবে যখন কুরআন পেশ করা হয় তখন প্রত্যেকেই জানতো ইলাহ শব্দের অর্থ কি, রব কাকে বলা হয়। কারণ, তাদের কথোপকথনে এ শব্দদ্বয় পূর্ব হতেই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু কুরআন নাযিলকালে এ শব্দগুলোর যে অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ধীরে ধীরে সে অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা থেকে দূরে সরে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়লো। এর এক কারণ ছিল, আরবী ভাষার প্রতি সঠিক স্পৃহার অভাব, দ্বিতীয় কারণ ছিল ইসলামী সমাজে যেসব ব্যক্তির উদ্ভব হয়েছে তাদের কাছে ইলাহ, রব, দীন ও ইবাদতের সে অর্থ অবশিষ্ট ছিল না, যা কুরআন নাযিলকালে অমুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল। এ কারণে পরবর্তীকালের অভিধান এবং তাফসীর গ্রন্থে কুরআনী শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে এমন সব অর্থে যা পরবর্তীকালের মুসলমানরা বুঝতো। [কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ : ১২ পৃ.]

কুরআনের এ মূল পরিভাষা সম্পর্কে অনবগতির কারণে কি ভয়াবহ পরিণাম দাঁড়াল, এর সম্বন্ধে জনাব মওদুদী বলেন– এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্য ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি হতে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। [কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ : দশম সংস্করণ : ১৪ পৃ.]

জনাব মওদুদী এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, তিন চতুর্থাংশের শিক্ষা বর্তমানে দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা নিজে কুরআনের হিকমতের কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

এখন আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ইসলামের সঠিক আকীদা, দর্শন ও ব্যাখ্যা কি তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা

ইসমত ও নিষ্পাপতা নবুওয়াতের অপরিহার্য গুণ। নবী থেকে, রাসূল থেকে রিসালাতের পৃথক হওয়া যেমন এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করা যায় না, তেমনি এ কথারও কল্পনা করা যায় না যে, নবী ও নবুওয়াত হতে, রাসূল ও রিসালাত হতে পলক মাত্র সময়ের জন্যও ইসমত আলাদা হতে পারে। তাই ইসলামের আকীদা হল, আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মাসুম। পাপাচার ও নাফরমানী তাঁদের থেকে প্রকাশ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং 'নবীগণ মানুষ' এ কথা প্রমাণ করার জন্য, 'নবীগণ দু'একটি পাপকার্য করেছেন অথবা অমুক নবী দায়িত্ব পালনে কুতাহী ও ত্রুটি করে গিয়েছেন বা অমুক নবী আল্লাহ তাআলার অনুমতি না নিয়েই স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে পড়েছেন। এমনতর উক্তি করা নবী ও রাসূলগণ সম্পর্কে চরম ধৃষ্ঠতা বৈ কিছুই নয়। কারণ, এতে নবীদের অযোগ্যতা ছাবিত হওয়ার সাথে সাথে মহাজ্ঞানী সর্বদ্রষ্টা আল্লাহর উপরও নবী নির্বাচনে ভ্রান্ত ও অযোগ্য হওয়ার অপবাদ আপতিত হয়।

◗ ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.) ইবানাহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সকল সাহাবীই মুজতাহিদ ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জান্নাতী ও সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত বলে খোশ-খবরী দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁরা সকলেই নিজ ইজতিহাদের মধ্যে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের কাউকে কোন দোষারোপ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রশংসা করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁদের সম্মান করার ও তাঁদের প্রতি ভালবাসা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা তাঁদের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করে, আমাদেরকে তাদের থেকে বেযার

ও মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের উপর রাজি হোন।

ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এসাবা গ্রন্থে এবং খতীবে বাগদাদী কেফায়াহ গ্রন্থে আবু যুরআ' থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তিকে কোন সাহাবীর দোষ বর্ণনা করতে দেখ, তাহলে নিশ্চিত জানবে যে সে হল যিন্দিক।

ইমাম তাহাবী (রহ.) আকীদাতুত্তাহাবী গ্রন্থে লিখেছেন, যারা সাহাবীদের সঙ্গে শত্রুতা ভাব পোষণ করে অথবা তাঁদের কুৎসা রটায় আমরা তাদেরকে শত্রু বলে মনে করি। সাহাবীদেরকে আমরা ভাল ধারণার সঙ্গে স্মরণ করব।

শরহে ফিকহে আকবর নামক গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন, আমরা সাহাবীদের গুণচর্চা ব্যতিরেকে কখনো দোষচর্চা করব না।

আকায়েদের বিখ্যাত কিতাব আলমুসামারার ৩১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল, প্রত্যেক সাহাবীকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকী, পরহেযগার, ইসলামের ও উম্মতের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দানকারী মনে করা; তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা এবং তাঁদের দোষচর্চা করা কারো জন্য জায়েয নেই বরং সকলকেই সর্বদা তাঁদের গুণচর্চা করতে হবে।

◗ কুরআনের ভাষায় হিদায়েত কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ কিতাব অনুসারী মনীষীগণ উভয়ের উপরই মওকুফ। শুধু কিতাব পড়ে যেমন হিদায়েত লাভ করা যায় না অনুরূপভাবে শুধু রিজালের অনুসরণ করেও হিদায়েত হাসিল করা যায় না। বরং হিদায়েত লাভ করতে হলে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে উভয় সূত্রকেই। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, সনদ ব্যতীত ধর্মীয় কোন কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, দীনের ইফহাম ও তাফহীম, দীনের প্রচার ও প্রসার এবং দীন বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, আইম্মা, ফুকাহা, মুজাদ্দিদীন ও মুহাদ্দিসীন ও সুলাহায়ে উম্মতের নিরলস প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখা, তাঁদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাঁদেরকে অনির্ভরযোগ্য এবং দায়িত্বহীন ঘোষণা করারই নামান্তর। এতে তারা খুদ বখুদই সিলসিলায়ে সনদ থেকে হটে

যাচ্ছে। তাই হিফাযতে দীনের প্রয়োজনেই আকাবিরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

◗ আল্লাহর ঘোষণা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কুরআন মজীদের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যা হাদীস ও তাফসীরের মূল্যবান ভাণ্ডারে বিদ্যমান রয়েছে, কুরআন মজীদের সেরূপ ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, অন্যথায় পথচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পবিত্র হাদীসসমূহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মহামনীষী সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বর্ণনার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট পৌঁছেছে। এরপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম সাধ্যাতীত সতর্কতা অবলম্বন করত বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থাদি, যোগসূত্র ইত্যাদি যাচাই বাছাই ও উসূলে হাদীসের ভিত্তিতে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা গ্রহণ করেছেন। কাজেই হাদীসশাস্ত্র সত্য, বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য।

আকাবিরে উম্মত ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইজতিহাদ বা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত উসূল ও মূলনীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসআলার সঠিক হুকুম নির্ণয় করেছেন। এটাই ফিকাহ নামে পরিচিত। ফিকাহর কিতাবসমূহ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও অত্যাবশ্যকীয় কিতাব। আধ্যাত্মিক রোগসমূহ দূর করে যথাযথ তাআল্লুক মাআল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে সঠিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে ইবাদতের মান উন্নীত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট এক হক্কানী পথ প্রদর্শক মুরব্বীর পথ ও তরীকত নির্দেশ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সাধনা করাকে তাসাওউফ বলে। আমাদের দেশের প্রচলিত ভাষায় এ তাসাওউফের পথ প্রদর্শককে পীর ও তার পথনির্দেশ অনুয়ায়ী সাধনাকারীকে মুরীদ বলে। পরিভাষায় তাসাওউফের আমলকারীকে সুফী বলে। এ তাসাওউফ বা ধর্মীয় সাধনার প্রতি ইসলামে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

◗ যেমনিভাবে পুঁতিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ কাপড় সেলাই করতে পারে না,

ডাক্তারী পুঁথিপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না, অনুরূপভাবে শুধু কুরআন ও হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তালীম ও তরবিয়্যাতের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে সে পর্যন্ত দীনের তালীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'কুরআন ও তাফসীর পাঠ করে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়'– এ কথা একেবারেই অবাস্তব এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ কথা। কারণ, উস্তাদ ব্যতীত যদি পূর্ণাঙ্গ তালীম ও তরবিয়্যাত সম্ভব হত তাহলে কিতাবের সাথে নবী-রাসূল প্রেরণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, সহীহ এবং বিশুদ্ধতম জ্ঞান লাভ করার অন্যতম উপায় হল কামেল উস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা।

◗ আকীদা ও ঈমানের পর ইসলামে যে জিনিসটির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেটি হল ইবাদত। আর এ-ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই আল্লাহ বলেছেন, মানুষ এবং জিনকে কেবল ইবাদত করার জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি। এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও ইকামতে সালাতের জন্যই। তাই যথাযথভাবে নামায আদায় করাকে বুনিয়াদী আমল ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

এরা হচ্ছেন তারা যে, এদের যদি আমি রাজ্য ক্ষমতার অধিকারী বানাই তবে এরা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর হাতেই সকল কাজের পরিণাম। সুতরাং মৌল ইবাদত সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ ইত্যাদির গুরুত্বকে খাটো করে দেখা, এগুলোর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা দীনের বিষয়ে তাহরীফ বা বিকৃতি এবং কুফর ও ইলহাদের দরজা খুলে দেয়ারই নামান্তর।

◗ ইসলামের আকীদা হল, নিশ্চয়ই কিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন হবে। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশে হযরত ফাতেমার খান্দানের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর চেহারা নূরানী ও নাক সুগঠিত হবে। তাঁর চরিত্র হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রের ন্যায়। তিনি সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী হবেন এবং সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূরীভূত করে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ভয়ে তিনি মদীনা হতে মক্কায় চলে আসবেন, তখন লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলবেন এবং তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করবেন। ইহইয়ায়ে দীন, ইশাআতে ও হিফাযতে দীনের ক্ষেত্রে তাঁর এ মুবারক উদ্যোগের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতা তৎকালীন সকল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হবে। ইমাম মাহদী সম্পর্কে কল্পনাপ্রসূতভাবে নতুন কোন ধারণা পোষণ করা বা তিনি তৎকালীন যুগের সর্বাধুনিক ব্যক্তি হবেন বলে প্রচার করা হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতকে অস্বীকার করারই নামান্তর। এহেন উক্তি ও মন্তব্য থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

◗ কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। এর মর্ম ও শব্দ সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ পরিপূর্ণ একটি কিতাব। সকল প্রকার তাহরীফ মানুষের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন থেকে এটা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ও সংরক্ষিত। তাহরীফ হয়েছে বলে যদি কেউ বলে তবে সে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত নয়। শব্দগত দিক থেকে কুরআন যেমনিভাবে সংরক্ষিত অনুরূপভাবে অর্থের দিক থেকেও তা পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগে কোন বিশেষ পারিভাষিক শব্দের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা মুসলমানদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে'– মন্তব্য করা কুরআন অস্বীকার করারই নামান্তর। এহেন বিভ্রান্তিকর উক্তি থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

মনীষীদের বাণী

শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেছেন, মওদুদী জামাত একটি গোমরাহ ও ধর্মের মুখোশধারী ক্ষতিকারক একটি জামাত। এর আকায়েদ কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের প্রচেষ্টা পক্ষান্তরে ইসলামের জন্য নয় বরং নবগঠিত মওদুদী জামাতের জন্য। সুতরাং মুসলমানদের তা থেকে দূরে থাকা উচিত।

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেছেন, জনাব মওদুদী সাহেব হাদীস অস্বীকারকারী, গোমরাহ ও বিদআতী। এরূপ লোকের সঙ্গ হতে মুসলমানদের দূরে থাকা, তার কথায় কর্ণপাত না করা এবং তাকে সবচে' বড় জাহেল মনে করা একান্ত কর্তব্য।

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রসার ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব (রহ.) সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, জনাব মওদুদী সাহেব ইসলামের পুরাতন ফিকাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া নতুন ফিকাহ তৈরি করেছেন। অতএব, মুসলমানগণ তার ফিতনা থেকে দূরে থাকুন। দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজায আলী (রহ.) বলেছেন, মওদুদীর কর্মধারা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মওদুদী জামাত কাদয়ানী জামাত থেকেও অত্যন্ত মারাত্মক। আলেমকুল শিরোমণি, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ কাযেমী (রহ.) বলেছেন, জনাব মওদুদী সাহেবের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘ আলোচনার পর আমার নিকট এ সত্য উদঘাটিত হয়েছে যে, মওদুদী সাহেব কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা এক নতুন মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী বলে মনে করেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি তা প্রকাশ করেন না। হয়তো বা সময় আসলে তা প্রকাশ করতে পারেন।

'আল হাবীব' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ লাহোরী সাহেব বলেছেন, আমি মওদুদী সাহেবের পুস্তকাদি বিশদভাবে পড়ে দেখেছি। মওদুদী সাহেব ইসলামের যে অপব্যাখ্যা করেছেন তার প্রেক্ষিতে আমি স্বজ্ঞানে এ কথা বলতে পারি যে, তার প্রদত্ত ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এবং নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম ও সুফিয়ায়ে ইসলাম কর্তৃক গৃহীত মূল ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের প্রাক্তন খতীব হযরত মুফতী আবদুল মুঈয সাহেব (রহ.) বলেছেন, মওদুদী সাহেব প্রকৃতপক্ষে কোন আলেম নন। কুরআন হাদীস সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা বা জ্ঞান তার নেই। দীনের আকায়েদ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজকে গোমরাহ করাই তার মূল লক্ষ্য। তার প্রবর্তিত ফিতনা থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের দীনি দায়িত্ব।

দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনৌরী সাহেব বলেছেন, এ শতাব্দীর বিরাট ফিতনা হল জামাতে ইসলামী। এ দল নিজেদের সঙ্গে ইসলামের সুন্দর নাম লাগিয়ে ইসলামের মূল রূপকে পাল্টিয়ে দিয়েছে। পরকালের সফলতার জন্য আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মওদুদী তা লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। আজ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত সমস্ত নির্ভরযোগ্য বুযুর্গানেদীনকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছেন। সর্বজন স্বীকৃত মুসলমানদের আকায়েদের উপর তিনি কুঠারাঘাত করেছেন। হাদীসে বর্ণিত গোমরাহ দলগুলো চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে যেসব বিভ্রান্তিকর কাজ করেছে, এ দলটি একাই সে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিয়েছে।

এ ছাড়া আরো বহু উলামায়ে কেরাম মওদুদী ও তার জামাত সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন। এদের মধ্যে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, পশ্চিমবঙ্গ তাবলীগী জামাতের আমীর হযরত মাওলানা আবদুল হক সাহেব, তাবলীগী নেসাবের রচয়িতা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া সাহেব, পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী হযরত মাওলানা গোলাম গাউছ হাজারুবী, চরমোনাইর পীর হযরত মাওলানা ইসহাক সাহেব, শর্ষিনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা

নেছারউদ্দীন আহমদ সাহেব, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ সাহেব, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী হযরত মাওলানা মাহদী হাসান সাহেব, মুলতান খায়রুল মাদারিসের প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ প্রমুখ।

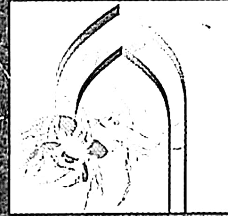
সুতরাং আমাদের যদি নিজের ঈমান, দীন ও ইসলামকে হিফাযত করতে হয় তবে এসব ভ্রান্ত আকীদা ও দল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করার প্রয়াস চালাতে হবে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর কায়েম রাখুন। আমীন!

সমাপ্ত



ইসলামী জীবন



আমাদের প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লেখকের আরো কয়েকটি বই









মাকতাবাতুল আখতার

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা ও বিপনন কেন্দ্র]

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ● মোবাইল : ০১৮১১১৫৮০১৭, ০১৭১৮৫২৭১০২, E-mail: aaziz@bangla.net